ইরাণী উপকথা

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

১৪ই আশ্বিন, ১৩২৭।

মূল্য ১৷০

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ড্রাগ প্রেসে
কে, সি, বসু দ্বারা মুদ্রিত,
৪৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রকাশক,
শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ,
আর্য্য পাবলিশিং হাউস,
৪-এ, মোহন লাল ষ্ট্রীট,
শ্যামবাজার পোঃ,
কলিকাতা।

উৎসর্গ পত্র।

———০———

শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

এই গ্রন্থের কয়েকটী গল্প যখন মুখে মুখে কতকটা ভাঙা ভাঙা কতকটা সাজিয়ে আপনার কাছে বলেছিলেম তখন তা আপনার ভাল লেগেছিল। সেই জন্য এই গ্রন্থখানি আপনার হাতে প্রদান করতে সাহসী হলুম। ইতি—

মণি।

সূচী-পত্র।

ইরাণী উপকথা।

———:o:———

একান্ন বৎসর বয়সে ইরাণ-তুরাণের বাদশা হুশেন শাহ্ যখন সাতান্ন সংখ্যক বেগমের পাণি-পীড়ন করলেন, তখন—তখন কে জান্‌ত যে তাঁরই রাজপ্রাসাদে আরব্য উপন্যাসের নিছক রূপকথাগুলোর একটা এসে নিজের বাস্তবতা প্রমাণ করে' যাবে?

সে যাই হোক্। বাদশা নতুন বেগমের পাণি-পীড়ন ক'রে তাঁর হারেমে পুরলেন, এদিকে সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দরবারের আমীর ওমরাহ্‌দের মধ্যে কেমন করে' জানাজানি হয়ে গেল যে, নতুন বেগমের মত সুন্দরী ত্রিভুবনে নেই। অপ্সরী?—অপ্সরীরা ত সব চির-যৌবনা। যা চিরদিনের, যার ক্ষয়বৃদ্ধি নেই, যা স্থির, তা হাজার সুন্দর হোক কিন্তু তাতে মোহের অবসর নেই। ফুলগুলো ফুটে উঠে ঝরে' যায় বলেই ত ওর সৌন্দর্য্য মুহূর্ত্তের তরে নিবিড়তম হ'য়ে দেখা দেয়, সেই জন্যেই ওর মোহ অনন্ত কালের। নতুন বেগমের ভোম্‌রা রঙের রেশমী চুলের রাশ যে একদিন শণের নুড়ি হ'য়ে উঠবে—তার আঙুরের রসে ভিজান হিঙ্গুল রঙের ঠোঁট দুখানি যে একদিন শুকিয়ে চামড়ার মত হ'য়ে উঠবে—তাজা ফুলের মত গাল দুটো যে শুক্‌নো পাতার মত চুমড়ে যাবে—চোখের কোণ থেকে তড়িৎ ঢলঢলি যে আর চলবে না—তার বুক যে আর দুলবে না, গ্রীবা যে আর হেলবে না, হৃদয় যে আর টলবে না—এই

চিন্তাই যে হুশেন শাহ্‌কে চতুর্গুণ মাতিয়ে তুলেছে। সুতরাং অপ্সরী?—না, নতুন বেগমের সঙ্গে অপ্সরীর তুলনাই হয় না। অপ্সরী ত নয়ই—মানব মানবীর মধ্যেও এমন রূপ আর কখনও সৃষ্ট হয় নি—আর ভবিষ্যতেও হবে কিনা সে বিষয়ে বাদশা হুশেন শাহের ঘোর সন্দেহ।

কিন্তু আমীর ওমরাহ্‌দের মধ্যে নতুন বেগমের রূপের কথা রটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা আপশোষের কথাও জেগে উঠল। এমন সুন্দরী যে নতুন বেগম—যার দেহে বিশ্বকর্ম্মা তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রতিভার ছাপ অঙ্কিত করে দিয়েছেন—যার তুল্য সুন্দরী সসাগরা পৃথিবীতে নেই, অমরাবতীতে নেই, গন্ধর্ব্বলোকে নেই—তেমন রূপ একদিনের জন্যেও কারো নয়নগোচর হবে না, এই হচ্ছে তাঁদের আপশোষের কথা। তাঁদের মধ্যে দু' একজনা দার্শনিক ওমরাহ্‌ তাঁদের লম্বা শুভ্র দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে গালিচার বুনোনো রঙিন ময়ূরগুলোকে নিরীক্ষণ করে করে বলতে লাগলেন—তা' আসলে সৌন্দর্য্য জিনিসটা সকলের জন্যেই হওয়া উচিত—বিশেষতঃ রূপ দেখলে রূপের কোন ক্ষতি নেই অথচ দর্শকের মহা লাভ।

আমীর ওমরাহ্‌দের কানাকানি বাদশা হুশেন শাহের কানে পৌঁছিতে বড় বিশেষ বিলম্ব হ'ল না। হুশেন শাহ্‌ ছিলেন প্রজারঞ্জক রাজা। কাজেই আমীর ওমরাহ্‌দের এই আপশোষের কারণ দূর করবার জন্যে ইচ্ছা করলেন। তাই মনস্থ করলেন যে, নতুন বেগমের একখানি পূর্ণায়তন তস্বীর অঙ্কিত করিয়ে তাঁর আমদরবারের বিশাল কক্ষে মসনদের পিছনে দেয়ালের গায়ে ঝুলিয়ে

দেবেন। বাদশা মনে মনে এই ব্যবস্থা ঠিক করেই তাঁর প্রধান উজিরকে ডাকলেন—"ফজলু খাঁ"।

ফজলু খাঁ পামিরের মাথার উপরকার বরফের মত সাদা লম্বা-দাড়ি হেলিয়ে এসে কুর্ণিস করে' দাঁড়াল—"জাঁহাপনা"—

বাদশা বললেন—"উজির, বর্ত্তমানে এ সসাগরা পৃথিবীতে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী কে ?"

উজির হাতের পাঁচ আঙুল তাঁর লম্বা দাড়ির মধ্যে চালাতে চালাতে স্মৃতিশক্তিটাকে উগ্র করে' নিয়ে উত্তর করলেন—"জাঁহাপনা, বর্ত্তমানে এ সসাগরা পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী হচ্ছে হিন্দুস্থানের কোশল রাজসভার চিত্রকর—নাম মৌকূল দেব।"

হিন্দুস্থানের নাম শুনে বাদশা মুহূর্ত্তের জন্যে চিন্তান্বিত হলেন—যেন তাঁর মনে কোন সংশয় উদিত হয়েছে; কিন্তু তৎক্ষণাৎ যেন সে সংশয়ের একটা সমাধান করে বললেন—"ফজলু খাঁ, কোশল রাজসভার চিত্রশিল্পী ইরাণ-তুরাণের বাদশার দরবারের তরফ থেকে ইস্পাহানে আমন্ত্রিত হোক।"

ফজলু খাঁ তাঁর উষ্ণীষ হেলিয়ে কুর্ণিশ করে বললেন—"প্রবল প্রতাপান্বিত সুজনের রক্ষক দুর্জ্জনের শাসক ইরাণ-তুরানের বাদশা হুশেন শাহের যে আজ্ঞা।"

তার পরদিন পূব গগনে উষাসুন্দরী যখন আপনার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করবেন কি করবেন না ভাবছিলেন, তখন ইস্পাহানের প্রশস্ত পাথর-বাঁধা রাজপথ কাঁপিয়ে বাদশার পাঞ্জাঙ্কিত পত্র নিয়ে তুরুক সোয়ার কাবুলের পথে হিন্দুস্থান অভিমুখে যাত্রা করল।

দ্রুতগামী অশ্বখুরের খটাখট্ শব্দে নিদ্রিত নাগরিকেরা চকিত হ'য়ে উঠে বসল। বেলা হলে ইস্পাহানের বাজারে বাজারে রটে গেল যে, হিন্দুস্থান থেকে চিত্রকর আসছে—নতুন বেগমের তসবীর আঁকবার জন্যে।

(২)

বাদশা আমীর ওমরাহ্‌দের নিয়ে তাঁর খাস দরবারে বসে' ছিলেন। ইরাণ-তুরাণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি তায়েজউদ্দিন সেদিন হেমন্ত-সন্ধ্যার মত করুণ কণ্ঠস্বরে বাদশা-সমীপে সুন্দরী তরুণীর অশ্রু-ভেজা ব্যথিত কালো আঁখি-তারার মত একটা নব রচিত গজল্ সারেঙ্গী সহযোগে গান করছিলেন। গজল্ বলছিল—"রূপোর দেয়ালী লেগেছে - এমনি নিবিড় জোছনা, যেন মনে হয় তা মুঠো বেঁধে দলা পাকিয়ে ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ি খেলা যায়, শিশির-ভেজা পাতায় পাতায় জোছনা ছল্‌কে উঠে পিছ্‌লে পড়ছে—দূর এলবুরুজ পাহাড়তলীর বুল্‌বুল্‌রা সব আর সেদিন ঘুমুতে যায় নি—তাদের গানের সুর ঘন জোছনার বুক চিরে চিরে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে—এমনি রাতে নিঠুরা পিয়ারী বাহুর বাঁধন আল্‌গা করে' কাউকে কিছু না বলে' ক'য়ে কোন্ অজানার পথ ধরে' কোথায় চ'লে গেল—কোথায় গেল... .."

চারিদিকে মেঘে মেঘে ছেয়ে গিয়েছে—কালো কালো মেঘ, বিদ্যুৎ বুকে করা মেঘ। এলবুরুজ পাহাড়তলীর ময়ূরের দল পেখম তুলে নৃত্য করে' করে' তাদের কেকা রবে চারিদিক মুখর করে' তুলেছে। বারি ঝরতে আরম্ভ করল,—ঝর্ ঝর্ ঝর্—বিরাম নেই

বিরতি নেই—কত দিনকার কার অশ্রু—কোন্ অলকার কোন্ অপ্সরীর—এমনি বাদল-বুকের মধ্যে বসে' বসে' কে যে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে—এমন দিন, তবুও পিয়ারী ফিরে এল না—কেন এল না............"

"পিয়ারী কেমন করে' ফিরবে—পিয়ারী যে পথ ধরে গিয়েছে, সে ত ফেরবার পথ নয়—সে যে কেবল যাবারই পথ—সে পথ সে যে মরণের পথ.........."

সারেঙ্গীর মিষ্টি সুরের সঙ্গে কবির মিষ্টি সুর মিলে গজলের ব্যথাভরা কাহিনী, বাদশার খাস দরবারের প্রশস্ত কক্ষের কোণে কোণে কোন্-হারিয়ে-যাওয়া কা'কে খুঁজে বেড়াতে লাগল। যে আমীর ওমরাহ্‌রা যুবক, তাদের কি একটা ব্যথার আনন্দে বুক ফুলে উঠল, টলে উঠল—বাদশার খুড়ো আশী বছর বয়সের বৃদ্ধ বৈরাম খাঁর পর্য্যন্ত কুয়াশা-ঢাকা চোখ দুটো ছল্ ছল্ করে' উঠল। গান শেষ করে' কবি সারেঙ্গী ও ছড়টা গালিচার উপরে নামিয়ে রাখলেন—চারিদিকে নিস্তব্ধতা, কেবল সদ্য সমাপ্ত গজলের সুর বাতাসের বুক চিরে আকাশের গায়ে গায়ে একটা রেশের চিহ্ন এঁকে দিয়ে দূর হতে দূরান্তরে চলে যেতে লাগল—মুহূর্ত্ত ধরে' যেন কারো নিশ্বাস প্রশ্বাসও পড়ছে না—এমনি নিবিড় নিস্তব্ধতা। তারপর দরবারের সবাই যেন হঠাৎ চমক ভেঙ্গে জেগে সমস্বরে বলে' উঠলেন "ক্যাবাৎ ক্যাবাৎ !"

বাদশা সস্মিত হাস্যে কবির দিকে ফিরে বললেন—"তায়েজ, তোমার কাব্য সাধনা, সঙ্গীত সাধনা, যন্ত্র সাধনা, সবই সার্থক !"

কবি তায়েজ তাঁর বিনম্র শির আরও নত করে' কি বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় উজির ফজলু খাঁ প্রবেশ করে' বাদশা-সমীপে নিবেদন করলেন—"জাঁহাপনা, হিন্দুস্থান হ'তে কোশল-রাজসভার চিত্রশিল্পী গোকুল দেব ইরাণ-তুরাণের বাদশা, দুর্ব্বলের রক্ষক দুর্জ্জনের শাসক প্রবল প্রতাপান্বিত হুশেন শাহের দরবারে হাজির।"

বাদশা বললেন—"তাকে এইখানে নিয়ে আসা হোক।"

উজির তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেলেন, আবার পরক্ষণেই ফিরে এলেন—সবাই দেখলেন, তাঁর সঙ্গে প্রবেশ করল এক অতি সুন্দর তরুণ যুবক।

অতি সুন্দর তরুণ যুবক। তার চোখ দুটোতে যেন বিদ্যুতের রেখা টানা—কুঞ্চিত কেশ গুচ্ছে গুচ্ছে এসে তার বলিষ্ঠ স্কন্ধ ছেয়ে ফেলেছে—অতি চিক্কণ গোঁফের রেখার চিহ্ন তার স্ফুটনোম্মুখ যৌবনের ঘোষণা করছে—আঙুলগুলো যেন ছবির মত সুশ্রী—বাদশা বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন—"এই যুবক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রকর?"

যুবক তার মাথা অবনত করল, উজির ফজলু খাঁ উত্তর দিলেন—"হাঁ জাঁহাপনা।"

"এমনি তরুণ বয়সে!"

উজির উত্তর দিলেন—"জাঁহাপনা, প্রতিভাসুন্দরী তরুণের গলেই তাঁর বরমাল্য প্রদান করতে ভালবাসেন।"

বাদশা প্রসন্ন দৃষ্টিতে শিল্পীর দিকে ফিরে বললেন—"সুন্দর বিদেশী যুবক, চিত্রবিদ্যায় তোমার কতদূর পারদর্শিতা?"

যুবক উত্তর দিলে—"জাঁহাপনা, কবি, চিত্রকর, গায়ক এদের পারদর্শিতার মাপযন্ত্র অন্যের কাছে। আমার যে কি রকম

পারদর্শিতার তা আমি নিজে কেমন করে' বলব? তবে আমার অঙ্কিত চিত্রে হিন্দুস্থানের অনেক নৃপতি অনুগ্রহ করে' সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।"

বাদশা বললেন—"শোন যুবক, ইসলাম-রমণী কোনদিন বিধর্ম্মী-পুরুষের কাছে তার মুখাবরণ উন্মোচন করবে না, শাস্ত্রের নিষেধ—না দেখে তুমি তার আলেখ্য অঙ্কিত করতে পারবে?"

শিল্পী বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে "না দেখে কি করে ছবি আঁকা চলতে পারে জাঁহাপনা?"

বাধা দিয়ে বাদশা জিজ্ঞাসার সুরে বললেন "কেবল তার বর্ণনা শুনে।"

যুবক বললে—"এমন কবি কে আছে জাঁহাপনা যে শব্দ অর্থ ও সুর দিয়ে রক্তমাংস ও বর্ণকে এমনি করে' মূর্ত্তিমান করে' তুলতে পারে যা আবার রঙে ও তুলিতে পরিবর্ত্তিত করা যেতে পারে!"

গৌরবান্বিত দৃষ্টিতে বাদশা উত্তর দিলেন "বিদেশী যুবক! আছে, ইরাণ-তুরাণের শ্রেষ্ঠ কবি—যার কণ্ঠস্বরে শরৎ-উষার উজ্জ্বল আকাশ সান্ধ্য গগনের মত ব্যথিত হ'য়ে ওঠে—হেমন্ত-সন্ধ্যার করুণ রাগিণী বসন্ত-উষার মত হাস্যময় হ'য়ে ওঠে—যার সারেঙ্গীর আলাপে প্রচণ্ড নিদাঘে বর্ষার শৈত্য আমন্ত্রন করে' আনে—শীতের শুভ্র মাটীতে সবুজ রঙ জাগিয়ে তোলে—যুবক তুমি নিজেই বিচার করবে"—বাদশা কবি তায়েজকে গান করতে আদেশ করলেন।

সারেঙ্গীর সুর জেগে উঠল—কিশোরী প্রিয়ার সলজ্জ চাউনির

মত মিষ্টি, তার রেশমী চুলের স্পর্শের মত মোলায়েম—সে সুরের রেশ প্রিয়ার অঙ্গের স্পর্শেরই মত শ্রবণেন্দ্রিয়কে বুলিয়ে যায়।

"সুরমা-আঁকা চোখ—পিয়ারি সে কেমন চাতুরি ?—রজনীর কালো আঁধারের মাঝে পুঞ্জ মেঘের বুক থেকে বিদ্যুৎ কেমন ঝিলিক্ হানে ?—তাই পিয়ারীর কালো চোখের চার পাশে সুরমা আঁকা পিয়ারীর কালো চোখের তারা সে মেঘ—চোখের পাতায়-আঁকা সুরমা সে রজনীর আঁধার—পিয়ারীর দৃষ্টি সে বিদ্যুৎ—সে বিদ্যুৎ কেমন উজ্জ্বল, কেমন নিবিড়, কেমন তীব্র—সুরমা আঁকা চোখ—পিয়ারি সে কেমন চাতুরী ?"

"সুরমা-আঁকা চোখ—পিয়ারি জানি জানি সে কেমন চাতুরী। পিয়ারী যে চোখ দুটোতে সুরমা ঢেকে তার সারা দেহের আকাঙ্ক্ষা-রাশিকে গোপন করতে চায়—তার মনের শঙ্কা সঙ্কোচ সরম স্পষ্ট করে' তুলতে চায়—তার চঞ্চল দৃষ্টিকে নিবিড় করতে চায়—তার হাস্যময় দৃষ্টিতে ব্যথা ভরা দেখতে চায়—সুরমা-আঁকা চোখ—পিয়ারী জানি জানি সে কেমন চাতুরী।"

গান থামল—রইল শুধু একটা সূচী-সূক্ষ্ম রেশের আধ-লুপ্ত আধ-সুপ্ত রণন্।

তরুণ চিত্রকর প্রশংসমান নেত্রে বললে—"ইরাণ-তুরাণের কবি, হিন্দুস্থানের চিত্রকরের অভিবাদন গ্রহণ করুন।" তার পর বাদশার দিকে ফিরে বললে—"জাঁহাপনা, কবি তায়েজের ক্ষমতা অসাধারণ। কবির সুরে সুরে আমার তুলি চলবে—তাঁর গানের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বেগমের ছবি ফুটে উঠবে—তাঁর চোখ জেগে

উঠবে—তাঁর বুক দুলে উঠবে—গণ্ডে তাঁর গোলাপ ফুটবে—হাতে তাঁর চাঁপার কলি জাগবে—পায়ে তাঁর রক্তকমল বিকশিত হবে—তাঁর ওড়্না উড়বে, বেণী দুলবে, ঘাগ্‌রা ঝুলবে; কিন্তু তাঁর আত্মার কথা আমি বলতে পারব না জাঁহাপনা। কবি তায়েজের সুরের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বেগমের বাহিরকেই আমি দিতে পারব—জাঁহাপনা, তাঁর আত্মার সন্ধান আমি দিতে পারব না।”

বাদশা জিজ্ঞাসা করলেন—“কেন শিল্পী?”

শিল্পী উত্তর দিলে—“জাঁহাপনা, আত্মা যে সাম্‌না সাম্‌নি দেখবার জিনিষ—হাজার বর্ণনাতেও তার আসল পরিচয় নেই। শিল্পীর আত্মা দিয়ে নতুন বেগমের আত্মা স্পর্শ করতে না পারলে তার তুলির সঙ্গে তা কখন ধরা পড়বে না। এ আত্মায় আত্মায় স্পর্শ অনুবাদের ভিতর দিয়ে হ'তে পারে না। জাঁহাপনা, আমি ছবি আঁকব; কিন্তু তাতে আত্মার সন্ধান করবেন না।”

বাদশা বলে' উঠলেন—“কিন্তু নতুন বেগমের যে দেহের চাইতে আত্মা সুন্দর—আত্মা সুন্দর বলেই ত তার দেহ সুন্দর সেই আত্মাকে বাদ দিয়ে শুধু দেহের ছবি আঁকা—যেন গন্ধ বাদ দিয়ে গোলাপ ফোটান—নেশা বাদ দিয়ে মদ চোঁয়ান; কিন্তু বিধর্ম্মীর কাছে ইস্‌লাম-রমণী কেমন করে মুখ খুলবে?—উপায় কি?” বাদশা তাঁর দরবারের আমীর ওমরাহ্‌দের দিকে তাকিয়ে উজিরকে সম্বোধন করে বললেন—“ফজলু খাঁ উপায় কি?”

ইরাণ সাম্রাজ্যের প্রধান উজির বিমনা হলেন। আমীর ওমরাহ্‌রা পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলেন। সভা

নিস্তব্ধ—চারিদিকে একটুকু শব্দ নেই। সেই নিস্তব্ধতার মাঝে বৈরাম খাঁ তাঁর সুদীর্ঘ শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তার পর তাঁর দীর্ঘোন্নত শরীর বেঁকিয়ে কুর্ণিস করে বললেন—"জাঁহাপনা, উপায় আছে। নতুন বেগমকে বিধর্ম্মীর সাম্‌নে মুখ খুলতে হবে না—তা একখানি দর্পণের সামনে করলেই চলবে। সেই দর্পণে প্রতিবিম্বিত নতুন বেগমকে দেখলেই শিল্পীর উদ্দেশ্য সফল হবে। শাস্ত্রও রক্ষা হবে কর্ম্মও ঠেকা থাকবে না।"

বৈরাম খাঁর কথা শুনে সবার বিষণ্ণ মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল। বাদশা প্রশংসমান নেত্রে খুল্লতাত বৈরাম খাঁর দিকে তাকিয়ে উজিরকে লক্ষ্য করে বললেন—"ফজলু খাঁ, খুল্লতাত বৈরাম খাঁর যুক্তি গৃহীত হোক।"

দরবার ভাঙল। আমীর ওমরাহ্‌রা বৈরাম খাঁর বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করতে করতে নিজ নিজ আবাসে ফিরলেন।

(৩)

দ্বারে দ্বারে পুরু রেশমি পরদা—তারি পাশে পাশে উলঙ্গ কৃপাণ হাতে যমদূতের মত কালো হাব্‌সী খোজা। এখানে বুঝি ক্ষুদ্র মধু-মক্ষিকাটিরও প্রবেশ করবার পথ নেই। এখানে বুঝি আর কোন শব্দ নেই, কেবল দুধের মত সাদা কঠিন পাথরের উপরে রক্ত কমলের মত রাঙা কোমল পা ফেলে চলে-যাওয়া রূপসীদের নূপুর-নিক্কন, কেবল লীলায়িত তনুর ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে তাদের জঙ্ঘা-স্পর্শ-সুখে বিহ্বল ঘাগরার খস্ খস্ শব্দ, কেবল তাদের কৌতুক-উচ্ছ্বাস-উদ্দীপ্ত হাসির ছন্দময় গিটকিরি, কেবল কত কত উৎস হতে উচ্ছ্বসিত

গোলাপজলের বিরতিহীন ঝর্ ঝর্ শব্দ। এখানে বুঝি আর কোন গন্ধ নেই—কেবল কত কত তরুণীদের নিঃশ্বাস-বিচ্ছুরিত সুরভি, কেবল তাদের সুদীর্ঘ সুদীর্ঘ-বেণী কুন্তল হতে উৎসারিত স্বপ্নময় গন্ধাবলেপ, কেবল তাদের সারা অঙ্গ হতে উৎসৃষ্ট এক আবেশময় আভাস। এখানে বুঝি আর কোন রূপ নেই, কেবল সদ্য ফোটা গোলাপরাশির স্তবক, কেবল ফুল্ল প্রস্ফুটিত চম্পকদলের উগ্রতা। এখানে বুঝি আর কোন রস নেই, কেবল সাকির আপন-ভোলা বিফলতা, কেবল সিরাজির সকল-ভোলা মাদকতা। মানুষ জীবনকে ধরে' রাখতে পারে না, কিন্তু যৌবনকে ধরে' রাখতে চায়। এমনি বাদশার হারেম।

এখানে কত কত রূপসী তরুণীর কমল-চোখের কোমল দৃষ্টি কুয়াশায় ঢেকে গেল—কোমল মুখের কমল-হাসি শুকিয়ে উঠল—গ্রীবা আর হেল্‌ল না, বুক আর দুলল না, চরণ আর চল্‌ল না; কিন্তু শেষ নেই, আবার কত কত নব নব তরুণী এসে তাদের রূপ-যৌবন দিয়ে এখানটাকে ভরে' তুলল। বাদশা হুশেন শাহের কালো চুল শাদা হ'য়ে গেল, দন্তাভাবে গণ্ড শীর্ণ হয়ে পড়্‌ল, তড়িতাভাবে দৃষ্টি মলিন হয়ে উঠল, কিন্তু এখানটায় তাঁর রূপ-যৌবনের সম্পদ অব্যাহত। এমনি ইরাণ-তুরাণের বাদশার হারেম।

সেই হারেমে কত কত দ্বারে কত কত পরদা সরিয়ে কত কত কক্ষ অতিক্রম করে' কত কত হাবসী খোজার ক্রূর শার্দ্দুল-দৃষ্টির সামনে দিয়ে তরুণ শিল্পী বাদশা হুশেন শাহ্ ও উজির ফজলু খাঁর সঙ্গে প্রবেশ করল। হারেমে বিদেশী বিধর্ম্মীর আভাস পেয়ে

বেগমদের পোষা ময়ূরের দল একবার ভাষণ কেকারবে যেন তাদের আপত্তি জানিয়ে দিল। তার পর হারেমের এক প্রান্ত হতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত যাদুমন্ত্র বলে নিমেষে যেন একটা পুরু নিস্তব্ধতার গালিচা বিছিয়ে গেল। কত কত মরাল গতির ছন্দে ছন্দে শিঞ্জিনী-নিক্কনীর অর্দ্ধেক ফুটে আর অর্দ্ধ ফোটার আর অবসর পেলে না—কত কত হাসির গিটকিরি মাঝপথে এসে হঠাৎ চকিতে থেমে গেল—যেন সজীব যা যেখানে ছিল সব সেই সেইখানেই সেই অবস্থাতেই সহসা প্রস্তরের মত কঠিন হ'য়ে গেল—চারিদিকে কেবল নিস্তব্ধতা—সেই নিবিড় নিস্তব্ধতার মাঝে কেবল গোলাপবারির ঝর্ ঝর্ শব্দ। সেই নিস্তব্ধতার মাঝে বাদশা শিল্পী ও উজিরকে নিয়ে একটি প্রকাণ্ড কক্ষে প্রবেশ করলেন।

কক্ষের এক পার্শ্বে দেয়ালে-গাঁথা এক সুবৃহৎ দর্পণ—একটা ক্রুদ্ধ-চক্ষু ঘোর রক্তবর্ণ সাটিনের মাঝখানে জড়োয়া কাজের একটা প্রকাণ্ড অর্দ্ধচন্দ্র আঁকা পরদায় আগাগোড়া ঢাকা। বাদশা উজির ও শিল্পী তিন জনে এসে সেই দর্পণের সামনা সামনি কক্ষের অপর প্রান্তে দাঁড়ালেন। অদৃশ্য হস্তের টানে পরদা সরে গেল। রত্নখচিত সিংহাসনে উপবিষ্ট নতুন বেগমের প্রতিবিম্ব দর্পণের গায়ে ফুটে উঠল—

যেন মসী-লিপ্ত আমাবস্যার অন্ধকারের-বিরাট গহ্বর হতে শরৎ পূর্ণিমার লক্ষ চাঁদ সহসা এককালে জেগে উঠল—যেন কঠিন রসহীন প্রাণহীন পাষাণের বুক চিরে এককালে-ফোটা বসোরার গোলাপ ফুটে উঠল—যেন ঘোর অমানিশার পুঞ্জ মেঘের বুক চিরে বিদ্যুতের

রেখা ফুটে অচঞ্চল হয়ে চারিদিক উদ্ভাসিত করে' রাখল—যেন—।
বাদশা বললেন—"শিল্পী, এই তোমার আলেখ্য।"

বাদশা শিল্পীর দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখলেন, বুঝলেন তাঁর কথা শিল্পীর কানে যায় নি—তার দৃষ্টি দর্পণে নিবদ্ধ—শিল্পী মন্ত্রমুগ্ধ—বাহ্যজগত তার কাছে লোপ পেয়েছে। বাদশার ঠোঁট দুখানিতে একটা তৃপ্তির, একটা গৌরবের, যেন একটা বিজয়ের নিঃশব্দ হাসির রেখা অঙ্কিত হ'য়ে গেল।

শিল্পীর দৃষ্টিতে কি ছিল—দর্পণে প্রতিবিম্বিত মূর্ত্তির অবনত চোখ দুটি ধীরে ধীরে যেন মন্ত্রচালিত হ'য়ে উত্তোলিত হয়ে মন্ত্রমুগ্ধ শিল্পীর প্রতি নিবদ্ধ হল—সেই চোখ দুটিতে বিস্ময়ের একটা ক্ষণিক প্রভা যেন মুহূর্ত্তের জন্য খেলে গেল—তার আজীবন সংগোপিত অনন্ত গোপন আকাঙ্ক্ষা আকুলতার আড়াল থেকে দুটি তরুণ চোখ আর দুটি তরুণ চোখের সঙ্গে মিলিত হ'ল—দর্পণের মূর্ত্তি যেন তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে একটা পুলক নিয়ে কেঁপে উঠল—শিল্পীর স্নায়ুতে স্নায়ুতে যেন একটা তড়িৎ প্রবাহ চারিয়ে গেল—তার পর নারীর দৃষ্টি অবনত হয়ে গেল—পুরুষের চোখে পলক পড়ল না। দর্পণের মসৃণ গায়ের উপরে মনে হ'ল কে যেন সিঁদূর ঢেলে দিল। অদৃশ্য হস্তের টানে পরদার দর্পণ ঢাকা পড়ল। শিল্পী চমক ভেঙ্গে জেগে উঠল—দেখলে চারিদিক যেন সন্ধ্যার মত মলিন হ'য়ে উঠেছে।

বাদশা বললেন—"শিল্পী—"

তরুণ যুবক সংযত স্বরে বললে—"জাঁহাপনা, আমি হিন্দুস্থানের

রাজন্যবর্গের অনেক অনেক অন্তঃপুর-মহিলাদের দেখেছি, কিন্তু এমন রূপ কখনও আমার নয়নগোচর হয় নি।”

স্মিত হাস্যে বাদশা বললেন—“শিল্পী, যা চোখে দেখলে, তাই যদি চিত্রপটে ফুটিয়ে তুলতে পার, তবে লক্ষ স্বুবর্ণ মুদ্রা তোমার পুরস্কার।”

শিল্পী উত্তর করলে—“জাঁহাপনা, আমাকে ছয় মাস সময় দিন। আর আমি চাই একটি নির্জ্জন নিভৃত স্থান, অতি নিভৃত, যেখানে বাইরের জগতের রাগ রঙ্গ হাসি অশ্রু আমার প্রাণে কোন ঢেউ-ই তুলবার সুযোগ পাবে না—যেখানে একান্ত ভাবে থাকবে আমি আর আমার আলেখ্য।”

বাদশা উজিরের দিকে ফিরে বললেন—“ফজলু মতিমঞ্জিলে শিল্পীর বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হোক্।”

তিন জনে হারেম ত্যাগ করলেন।

আবার তরুণীদের কলকণ্ঠ ফুটে উঠল। তাদের পায়ে পায়ে কত কত লাস্য নিয়ে নূপুর নিক্কণ জেগে উঠল, তাদের হাস্যোচ্ছ্বাস কক্ষে কক্ষে রণিত হ'য়ে উঠল কিন্তু সেদিন সেই হারেমে একটি নিভৃত কক্ষে একটি তরুণীর অন্তরে অন্তরে একটা নবীন স্বপ্নের আভাসে যে একটা নব তন্ত্রী বাজতে লাগল, তার সঙ্গে সেই তুচ্ছ প্রতিদিন-কার উদ্দেশ্যহীন হাসি-গানের কোনই মিল রইল না।

(৪)

সসাগরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রকর সে, দেশ বিদেশে কোটী কোটী নর নারীর মুখে মুখে তার নাম ফিরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু সে

নিজে এতদিন কোথায় ছিল? কোথায় আপন-ভোলা হ'য়ে ঘুরছিল? কি জীবন সে এতদিন যাপন করেছে? কি জীবন? কোন্ একান্ত বাইরে বাইরে সে তুলি আর রঙ নিয়ে কেবল কি এক তুচ্ছ খেলা করে' বেড়িয়েছে? শিল্পী সে কিন্তু এই এত দিন তার কাছ থেকে জীবনের অমৃতের উৎস এমনি করে' গুপ্ত হয়েছিল যে, তার অস্তিত্বের সন্দেহমাত্র তার মনে জাগে নি! তার তুলির মুখে কত কত সুন্দরীর ভোম্‌রা-কালো আঁখি-তারা বিশ্ব-বিমোহিনী দৃষ্টি নিয়ে জেগে উঠেছে, তার তুলির সোহাগে সোহাগে কত কত তরুণীর হৃদয়ের উপরে অঞ্চল-ঢাকা ভরা-বুক আধ আভাস নিয়ে মাথা তুলেছে, তার তুলির আদরে আদরে কত কত কমলের মত হাত চাঁপার কলির মত আঙুল নিয়ে ফুটে উঠেছে, কিন্তু তার পিছনে কি ছিল? আজ যে সে জানে যে, তার পিছনে ছিল তার কেবল অপূর্ণতা—আর অপূর্ণতা—আর অপূর্ণতা। তার পিছনে ছিল না শিল্পী তার সবখানি নিয়ে, ছিল না শিল্পীর নিগূঢ় জীবনের নিবিড় চরম আনন্দের অনুভূতি, ছিল না শিল্পীর নিজেকে নিঃশেষে ঢেলে দেওয়া। সে কেমন করে' কাটিয়েছে, কেমন করে'!—এই অসম্পূর্ণতা নিয়ে, এই বিরাট শূন্যতা নিয়ে—কেমন করে' সে এতদিন ছিল, কেবল এই রঙ তুলি ও চিত্রপটের বিরাট ব্যর্থতাভরা ব্যঙ্গ নিয়ে? হায়! তার নিগূঢ় আনন্দের উৎসটি এতদিন কে এমন করে' নিষ্ঠুর ভাবে তার অলক্ষ্য করে' রেখেছিল!

কিন্তু আজ তার কোন্ নিগূঢ় অন্তরের গোপন কক্ষে কোন্ একটা মণি- মুক্তা খচিত বীণার স্বর্ণ-তারে কার অদৃশ্য অঙ্গুলির স্পর্শ

পড়ল—সেই স্পর্শে যে সুর বেজে উঠল— সেই সুরে তার আজ একি হয়ে গেল! একি বেদনা, একি আনন্দ! তা ত আজ তার বুঝবারও ক্ষমতা নেই—আজ যে কেমন তার বেদনা আর আনন্দ একেবারে ছড়িয়ে গেছে, দুটোকে আর ত তার আলাদা করবার উপায় নেই—আজ যে কেমন তার মনে হচ্ছে, বেদনাও আনন্দ—আনন্দও বেদনা। মৌকূল, মৌকূল, এতদিন কোন্ মরুভূমির মধ্যে পিপাসা নিবারণের জন্যে ঘুরে ঘুরে মরছিলে!

ঐ যে নিগূঢ় গোপন বীণার তারে ঝঙ্কার—কি ঐশ্বর্য্যময় সে ঝঙ্কার—সেই ঝঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে যে আজ এক নিমেষে সব নিবিড় অর্থপূর্ণ হয়ে উঠল—চোখে যে কিসের অঞ্জন লেগে গেল—এই ধরিত্রীর মাটিতে মাটিতে এত গান, এত সুখ, এত সৌন্দর্য্য—এই যে মতিমঞ্জিল, ঐ যে তরুশ্রেণী, ঐ যে কুসুমকুঞ্জ, ঐ যে লতাবিজন-সব যেন কেমন উজ্জ্বল কেমন সজীব হয়ে উঠল। শিল্পী, শিল্পী, তুমি এতদিন কোন্ অন্ধ-করা অরণ্যে কেবল মুক্তির পথ খুঁজে মরছিলে!

দুটি তরুণ চোখ আর দুটি তরুণ চোখ—তাদের মিলনে এমনি রহস্যের সৃষ্টি, এমনি অমৃতের উৎস, এমনি দিকে দিকে পুলক জেগে উঠল, আকাশে বাতাসে হিল্লোল খেলে গেল, জল স্থল রঙিন হয়ে উঠল!

সে আজ ছবি আঁকবে—নতুন বেগমের। নতুন বেগম! না—না—না—নতুন বেগম কে? তাকে ত সে তেমন করে' জানে না—তার সঙ্গে ত শিল্পীর কোনই পরিচয় হয় নি। না—না—সে

নতুন বেগম নয়,—ইরাণ-তুরাণের কেউ নয়—বাদশা হুসেন শাহের কেউ নয়—তার হারেমের কেউ নয়—সে যে শিল্পীর নিভৃত গোপন-মনের মন্দিরের দেবী—যে কোমল স্পর্শে তার হৃদয়-বীণায় মোহন রাগিণী বাজিয়ে তুলেছে—তার দৃষ্টিসম্পাতে তার হৃদয়-পদ্ম প্রত্যেক দলটি নিয়ে ফুটে উঠেছে। না—না—সে নতুন বেগম নয়—ইরাণ-তুরাণের কেউ নয়—বাদশা হুসেন শাহের কেউ নয়—তার হারেমের কেউ নয়—সে যে শিল্পীর নিভৃত গোপন হৃদয়-মন্দিরের প্রণয়িনী—যার গণ্ড কপোল কণ্ঠ শিল্পীর দৃষ্টিতে লাজ-লালিমায় রক্তিমাভায় ছেয়ে গিয়েছে—যে শিল্পীর দৃষ্টি-বিনিময়ে তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে পুলক নিয়ে কেঁপে উঠেছে—না, সে বৃদ্ধ হুসেন শাহের নতুন বেগম নয়—সে যে চিরতারুণ্যের জীবন-মন্দিরে যুগযুগান্তরের সঙ্গিনী!

তারি, কেবল তারি ছবি সে আঁকবে? নতুন বেগম? নতুন বেগম?—নতুন বেগম বলে কেউ এই পৃথিবীতে নেই—নেই নেই। নেই—এই ব্রহ্মাণ্ডে ইরাণ-তুরাণ বলে' কোন স্থান নেই—বাদশা হুশেন শাহ্ বলে' কোন ব্যক্তি নেই—তার হারেম বলে কোন কারাগার নেই—সেখানে নতুন বেগম বলে কোন বন্দিনী নেই। আছে শুধু অনন্ত শূন্য অনন্ত অবসরের মাঝে দুটি তরুণ তরুণী, দুটি প্রেমিক প্রেমিকা—আছে শুধু দুটি হৃদয়, চারটি আঁখি, একটি অনন্তকালের নিবিড় চুম্বন। এই আর কিছুই নয়।

কেবল তারই ছবি সে আঁকবে। যে-ছবি সে আঁকবে—কেবলই কি তুচ্ছ রঙ দিয়ে? তুচ্ছ রঙ দিয়ে! তার হৃদয়-

শোণিতের বিন্দুতে বিন্দুতে যে আলেখ্যের প্রত্যেক অণু পরমাণু প্রাণ পাবে—তার নিশ্বাসে নিশ্বাসে যে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জেগে উঠবে, তার আত্মার স্পর্শে স্পর্শে তা চিত্রপটে ফুটে উঠবে—তুচ্ছ তুলি আর রঙ ?—না।

শিল্পী এক মনে মতিমঞ্জিলে ছবি আঁকতে লাগল।

ধীরে ধীরে তার কাছে বাহ্যজগত লোপ পেয়ে গেল। মতিমঞ্জিল তার বিস্তীর্ণ উদ্যান—বিশাল তরুশ্রেণী—নিবিড় লতাবিতান, সব অদৃশ্য হ'য়ে গেল—রইল শুধু তার চোখের সামনে একটি তরুণীর মূর্ত্তি—কুন্তল যার নিবিড়, দৃষ্টি যার গভীর, বক্ষে যার ইঙ্গিত, কক্ষে যার সঙ্গীত, জঙ্ঘা যার বিরহ-কাতর, চরণ যার নিগড় বাঁধা।

শিল্পী এক মনে ছবি আঁকতে লাগল।

(৫)

দেখতে দেখতে ছ'মাস কেটে গেল।

গোধূলির স্বর্ণে স্বর্ণে পশ্চিমাকাশে গৈরিক ওড়্না উড়িয়ে পূরবী রাগিণী বেজে উঠেছে—বাদশা হুশেন শাহ্ ফজলু খাঁকে সঙ্গে নিয়ে মতিমঞ্জিলে এসে উপস্থিত হলেন। শিল্পীকে বললেন—"শিল্পী, তোমার ছ'মাস শেষ।"

শিল্পী আভূমি প্রণত হ'য়ে উত্তর দিলে—"জাঁহাপনা, আলেখ্যও শেষ।"

বাদশা বললেন—"আজ হিন্দুস্থানের চিত্রকরের ক্ষমতা কতদূর, তার বিচার হবে শিল্পী।"

শিল্পী বিনম্র শিরে বহু কক্ষ অতিক্রম করে' বাদশা ও উজিরকে

মতিমঞ্জিলের নিভৃততম অংশে একটি কক্ষে নিয়ে এল। গোধূলি লগ্নে কক্ষের মধ্যে আঁধার হ'য়ে এসেছে। শিল্পী রৌপ্য-দীপদানে ছুটি দীপ জ্বালিয়ে তার চিত্রপটের ছু'পাশে রক্ষা করল। চিত্রপটের উপরে পরদা ঢাকা।

পরদা-ঢাকা চিত্রপটের সামনে এসে বাদশা ও উজির দাঁড়ালেন। শিল্পী ধীরে ধীরে চিত্রপটের উপর থেকে পরদা সরিয়ে নিয়ে এক পাশে এসে দাঁড়াল।

বাদশার কোষের অসি ঝন্ ঝন্ করে' বেজে উঠল, তাঁর হাতের আকর্ষণে খাপ থেকে তা' অর্দ্ধেক বেরিয়ে এল। শিল্পী তৃপ্তির হাস্যে শান্তস্বরে বললে—"জাঁহাপনা, এ আলেখ্য মাত্র।"

ইরাণ-তুরাণের বাদশা লজ্জিত হয়ে তরবারি আবার খাপে পুরলেন। কণ্ঠ হ'তে বহুমূল্য মণিহার খুলে শিল্পীর গলায় পরিয়ে দিলেন। তারপর বাদশা আর উজির দুজনে বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে আলেখ্যের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এ ত রঙ দিয়ে আঁকা ছবি নয়—এ যে মূর্ত্তিমান রক্তমাংসের শরীর! কে বলবে নতুন বেগম আজ বাদশা হুশেন শাহের হারেমে—সে আজ মতিমঞ্জিলের একটি নিভৃত কক্ষে রত্নখচিত সিংহাসনে উপবিষ্টা!

প্রথম বিস্ময়ের কথঞ্চিৎ উপশমে বাদশা বললেন—"শিল্পী, তোমার শক্তি অলৌকিক, ঐশ্বরিক—লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রার পরিবর্ত্তে পাঁচ লক্ষ তোমার পুরস্কার—হিন্দুস্থানের নৃপতিরা না বলে ইরাণ-তুরাণের বাদশা গুণের আদর করতে জানে না! আর শিল্পী, কাল প্রাতে অনুচরবর্গ নিয়ে কোতোয়াল আসবে, আলেখ্য রাজপ্রাসাদে

স্থানান্তরিত করবার জন্যে—সেজন্যে প্রস্তুত হয়ে থেকো। শিল্পী, তুমি নতুন বেগমের ছবি আঁক নি, দ্বিতীয় নতুন বেগমের সৃষ্টি করেছ।”

বাদশা ও উজির মতিমঞ্জিল ত্যাগ করলেন।

ওঃ প্রলয়! মুহূর্ত্তের মধ্যে শিল্পীর পায়ের নীচেকার কক্ষতল প্রলয়-ঘূর্ণনে ঘুরতে লাগল! কক্ষের আসবাব সব তার চোখের সুমুখে যেন মত্ত হয়ে নাচতে লাগল, চারিদিকের দেয়াল যেন দুলতে লাগল, দীপদানে দীপ যেন মরণাহত মানুষের হাসির মত বীভৎস হয়ে উঠল, শিল্পী টল্‌তে টল্‌তে চিত্রপটের সামনে মেঝের উপরে বসে পড়ল!

স্বপ্ন! স্বপ্ন! সব স্বপ্ন—আপনার চারিদিকে স্বপ্নের জাল বুনে এতদিন কি প্রবঞ্চনার মাঝেই না সে এই ছমাস কাটিয়েছে!—কোথায় সে? কে সে!—মিথ্যা—মিথ্যা—সব মিথ্যা। তার চাইতে অনেক বেশি সত্যি, লক্ষ কোটী গুণ সত্যি, ভয়ঙ্কররূপে সত্যি এই ইরাণ-তুরাণ, ইরাণ-তুরাণের বাদশা হুশেন শাহ্, হুশেন শাহের হারেম, আর সেই হারেমে বন্দিনী নতুন বেগম—সত্যি সত্যি, ওগো অতি সত্যি, নিষ্ঠুর ভাবে সত্যি, নির্ম্মম ভাবে সত্যি, মৃত্যুর মত সত্যি।

সেই হুশেন শাহের রাজপ্রাসাদে এই আলেখ্য স্থানান্তরিত হবে কাল—একটি মাত্র রজনীর অবসানে। এই আলেখ্য, যে আলেখ্যের প্রতি অণুতে অণুতে তার অস্তিত্ব বিছিয়ে আছে, যে আলেখ্য মাসে মাসে দিনে দিনে নিমেষে নিমেষে আপনার প্রত্যেক চিন্তাটি দিয়ে, প্রত্যেক বিশ্বাসটি দিয়ে, প্রত্যেক ইচ্ছাটি দিয়ে, প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষাটি

দিয়ে, সে জাগিয়ে তুলেছে—তাই একজনে একটি মাত্র কথায় চির-দিনের জন্যে তার কাছ থেকে অপসারিত হবে। বাদশার আম-দরবারে এই আলেখ্য ঝুলবে, লক্ষ লোকের চোখের তৃপ্তির জন্যে—তার জন্যে রইবে শুধু লক্ষ কণ্ঠে অজস্র বাহবা। শিরা হতে বিন্দু বিন্দু করে' রক্ত চুঁইয়ে বাহবা লাভ! না—না—চাই নে বাহবা, চাইনে লক্ষ দশ লক্ষ কোটী লক্ষ স্বুবর্ণ মুদ্রা, আমায় ফিরিয়ে দাও—ফিরিয়ে দাও কেবল এই আলেখ্যখানা!

বাতুল—বাতুল, এই আলেখ্য? ওরে শিল্পী, ওরে মূর্খ মৌকূল, কোথায় তোর মানসী কোথায়? এই আলেখ্য? তোর মানসী যে প্রত্যেক নিমেষটিতে বাদশা হুশেন শাহের অন্তঃপুরবাসিনী, সূর্য্যের আলোর পর্য্যন্ত যার মুখ দেখবার অধিকার নেই, এই আলেখ্য? জড়—জড়—কেবল রঙ আর রঙ আর রঙ—জড়—জড় অতি জড়। জড়? না—না—কে বললে জড়। ওরে নাস্তিক—ঐ যে, ঐ যে বুক দুল্‌ছে না কি? ঐ যে চোখের পাতায় অশ্রুবিন্দু কাঁপছে, ঐ যে ঠোঁট দুখানি পাংশু হয়ে উঠল—জড়? নয়—নয় কিছুতেই নয়— ঐ যে দীর্ঘ নিশ্বাসে বুক দমে গেল—ঐ যে ঘাঘরার প্রান্তটা কেঁপে উঠল না কি? পাগল—পাগল—এ যে একেবারেই জড়—শক্তিহীন, গতিহীন, ইচ্ছাহীন!

শিল্পী উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে সেই কক্ষতলে বসে আলেখ্যের দিকে অনিমেষ চোখে চেয়ে রইল। ঐ ঠোঁট দু'খানি যদি একবার—কেবল একবার মাত্র নড়ে' ওঠে, একবার মাত্র ডাকে—"শিল্পী"। ঐ চোখের তারা দুটি যদি কেবল একটিমাত্র নিমেষের জন্যে চঞ্চল

হয়ে ওঠে, যদি—যদি—যদি—আঃ কি নিষ্ঠুর শাণিত তরবারির একটুকু স্পর্শে তার সূক্ষ্ম কোমল স্বপ্নের জাল একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে অদৃশ্য হ'য়ে গেল, হাওয়ায় মিশিয়ে গেল। শিল্পী নিস্তব্ধ হয়ে বসেই রইল—দণ্ডের পর দণ্ড কেটে যেতে লাগল, সন্ধ্যার আঁধার ধীরে ধীরে নিবিড় কালো হয়ে উঠল, মতিমঞ্জিলের বৃক্ষে বৃক্ষে পাখীর ডাক সব নীরব হয়ে গেল, দণ্ডে দণ্ডে প্রহর কাটতে লাগল, শিল্পী ক্লান্ত দেহ মন নিয়ে ধীরে ধীরে কখন্ নিদ্রাভিভূত হয়ে গালিচার উপরে ঢলে পড়ল তা জানলও না।

* * * *

এদিকে মধ্যরজনীর নীরবতাকে মুখরতায় ভরিয়ে দিয়ে বাদশা হুশেন শাহ্‌র হারেমে মহা উৎসব চল্‌ছে। সহস্র দীপালোক রাত্রির অন্ধকার দূর করছে, অথচ তা দিনের একান্ত স্পষ্টতায় কোন দিকেই সমাপ্তি টানে নি— সবই কেমন রহস্যময়, আভাসময় ইঙ্গিতময়। বেলোয়ারী ঝাড়ের ঠুন্‌টান্, বলয় কঙ্কনের ঠিনি ঠিনি,নূপুর নিক্কনের রিনি-ঝিনি। কত কত রূপসী তরুণী হীরে মণি মুক্তা জহরতে ভূষিত। প্রত্যেক অঙ্গ সঞ্চালনে দীপ-রশ্মি স্পর্শে তাদের সারা দেহ হ'তে যেন তারার টুক্‌রো ছিটিয়ে ছিটিয়ে পড়ছে। তাদের নিবিড় কালো আঁখিতারা হতে অবিরাম ক্ষরিত হচ্ছে অমৃত ও হলাহল, জীবন ও মৃত্যু—ঐ যে দেখা যায় তাদের আবেশবিহ্বল আঁখি পাতে পাতে অঙ্কিত অমরার সিংহাসন আর গভীর গহন রসাতলের বিরাট গহ্বর।

অসংখ্য তরুণী রূপসী তাদের রূপের ডালি নিয়ে, চটুল চাহনি

নিয়ে, হাসির তরঙ্গ তুলে, উঠছে, বসছে, ঘুরছে, ফিরছে, চলছে। এই তরুণীদের মেলার মধ্যে বৃদ্ধ হুশেন শাহ্।

কি নিষ্ঠুর উৎসব! কি নির্ম্মম এই অসংখ্য তরুণীদের একটি বৃদ্ধকে ঘিরে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা সাধ আহ্লাদের সমাপ্তি! না জানি ঐ চটুল চাহনীর পিছনে কত শত দীর্ঘ নিশ্বাস সংগোপিত, ঐ হাল্কা হাসির পশ্চাতে কত শত হতাশার গুরুভার অটুট, কত কত জীবনের ব্যর্থতা, ঐ উৎসব রজনীর পশ্চাতে আপনার কড়া ক্রান্তির হিসেব টেনে চলেছে! প্রবল প্রতাপশালী হুশেন শাহ্, ঐ বিরাট ব্যর্থতার বিনিময়ে কিছু দান করবার ক্ষমতা তোমার হাতে নেই।

নতুন বেগম গান গাচ্ছিল—কি করুণ কি কোমল সে সুর! যেন তার আঁখির পাতে বিশ্বের অশ্রুরাশি থম্‌কে আছে, যেন তার ঠোঁটের কোণে সারা জগতের বিষাদ গুম্‌রে মরছে, আর তার কণ্ঠস্বরে কি মিষ্টি বীণার তানেই অশ্রুসাগর উথলে উঠছে!

"ওগো অচেনা, তুমি এমনি পরিচিত—এতদিন তবে কোথায় ছিলে? যখন প্রথম বুল্‌বুল্ ডেকেছিল, যখন প্রথম সিরাজির স্পর্শ স্নায়ুতে স্নায়ুতে চারিয়ে গিয়েছিল, যেদিন প্রথম দিগন্তের কোণে কোণে চোখ দুটি তোমার সন্ধানে ফিরছিল, সেদিন তুমি কোথায় ছিলে—কোথায় ছিলে?—"

"বুল্‌বুল্‌কে খাঁচায় পুরে দিলে, সিরাজি জহরত-মণ্ডিত পিয়ালায় রক্ষিত হল, চোখের সাম্‌নে আঁধার নেমে এল, অচেনা তুমি আজ কেমন ক'রে, কোথায় থেকে এলে?—"

"ওগো পরিচিত—কেবলই জল ঝরবে, মেঘ থেকে কেবলই জল ঝরবে, জোছনা আর খেলবে না, ফুল আর ফুটবে না, বুল্‌বুল্‌ আর ডাকবে না, ওগো তুমি চির-পরিচিত—

"ওঃ"—গান আর শেষ হল না। সহসা নতুন বেগম দু-হাতে বুক চেপে গালিচার উপরে লুটিয়ে পড়ল, তার মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে গেছে, চোখের তড়িৎ মলিন হয়ে গেছে।

বাদশা হুশেন শাহ্‌ চক্ষের পলকে এসে লুণ্ঠিতা নতুন বেগমের পার্শ্বে নতজানু হয়ে বসলেন—দেখলেন নতুন বেগম অতি কষ্টে নিশ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছে। বাদশা শঙ্কিত কণ্ঠে ডাকলেন—"পিয়ারী' পিয়ারী—"

হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে অতি কষ্টে নতুন বেগম উত্তর দিলে—"জাহাপনা' বাঁদীর গোস্তাকি মাপ করবেন। বুকের ভিতরটা হৃদ্‌পিণ্ডটা যেন কে চেপে চেপে ধরছে"— বেগমের শ্বাস ফুরিয়ে এল, আর কোন কথা ফুটল না।

তৎক্ষণাৎ বাঁদিরা ধরাধরি করে নতুন বেগমকে কক্ষান্তরে নিয়ে গেল, শয্যায় শায়িত করে দিলে, প্রতি মুহূর্তে তার শ্বাসকষ্ট উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হতে লাগল। হাকিমের জন্যে লোক প্রেরিত হল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নতুন বেগমের যেন নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্টের কতকটা উপশম হল, তার মুখ থেকে ধীরে ধীরে যন্ত্রণার চিহ্ন দূরীভূত হয়ে গেল, শান্তির নিশ্বাস ফেলে নতুন বেগম ধীরে ধীরে চোখ দুটি নিমীলিত করল, ধীরে ধীরে তার রঙিন্‌ ঠোঁটে রঙিনতর একটা হাসির রেখা অঙ্কিত হয়ে গেল।

হাকিম এলেন, নিদ্রিতা নতুন বেগমের নাড়ী স্পর্শ করলেন, একটা বিস্ময়ের ক্ষণিক আভা তাঁর চোখ দুটোতে খেলে গেল, আত্ম-সম্বরণ করে তিনি আবার দ্বিগুণ মনোযোগের সঙ্গে নাড়ী অনুভব করলেন, তারপর ধীরে ধীরে হাতখানিকে শয্যায় নামিয়ে রাখলেন। গম্ভীর কণ্ঠে হুশেন শাহের দিকে ফিরে বললেন—"ইরাণ-তুরাণের প্রবল পরাক্রান্ত বাদশা, জাহাপনা, নতুন বেগম এ নশ্বর জগত ত্যাগ করে' বেহেস্তের পথে যাত্রা করেছেন।"

বাদশার মুখ দিয়ে কথা সরল না।

শিল্পী স্বপ্ন দেখছিল। হিমাদ্রির কোন্ গহন গভীর নির্জ্জন গুহায় একমনে সে আপনার মানসীর ছবি আঁকছিল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর সে অনাহারে অনিদ্রায় ছবি আঁকছিল। সহস্র বৎসর পরে তার ছবি আঁকা শেষ হল। তখন শিল্পী সভয়ে দেখলে, এ ত আর কেউ নয়—এ যে নতুন বেগম। দেখতে দেখতে গিরিগুহা পরিবর্ত্তিত হয়ে মতিমঞ্জিল হয়ে গেল। হতাশায় শিল্পী তার অঙ্কিত আলেখ্যের সাম্‌নে লুটিয়ে পড়ল।

সহসা শিল্পী দেখলে ছবিতে আঁকা ওড়না যেন একটু কেঁপে উঠল, আলেখ্যের চোখের পাতা মিট্‌মিট্ করে' উঠল, চোখের তারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল, ধীরে ধীরে আঁকা মানসী-মূর্ত্তি চিত্রপট থেকে কক্ষতলে নেমে পড়ল' তার কানে এসে বাজল—"শিল্পী—"

শিল্পী ঘুম থেকে চমকে উঠল' জেগে দেখলে, তার সাম্‌নে

দাঁড়িয়ে এক তরুণী! স্তিমিত আলোকে তার মুখ দেখলে, ভয়ে বিস্ময়ে তার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল—"নতুন বেগম!"

স্বপ্নময়ী বললে—"শিল্পী নতুন বেগম মরেছে, আমি তোমার প্রণয়িনী, এস—রাত আর বেশি নেই—"

নিমেষে শিল্পীর ঘুমে ঘোর কেটে গেল—তার দেহের প্রত্যেক অণু-পরমাণু জাগ্রত হয়ে উঠল, তার শিরায় শিরায় তড়িৎ চারিয়ে গেল। এত স্বপ্ন নয়—এ যে সত্যি—অতি সত্যি! তৎক্ষণাৎ তরুণ যুবক উঠে দাঁড়াল, তরুণীর হাত ধরে' বাইরে এলো। রজনীর শেষ শুকতারা পূব গগনে জ্বল্‌-জ্বল্‌ করছিল। সেই শুকতারার অলোকে আলোকে প্রেমিক প্রেমিকা হাত ধরাধরি করে' দূর দিগন্তে কোথায় মিশিয়ে গেল।

(৬)

মানুষের হাজার শোক হোক্ রাজার রাজকার্য্য বন্ধ থাকে না। পরদিন বাদশা হুশেন শাহ্ কোতোয়ালকে মতিমঞ্জিল থেকে নতুন বেগমের তস্‌বীর আনবার জন্য পাঠালেন। কোতোয়াল অনুচরবর্গ নিয়ে মতিমঞ্জিল উদ্দেশ্যে চললেন। যথাসময়ে ফিরে এসে বাদশা-সমীপে নিবেদন করলেন—"জাঁহাপনা, মতিমঞ্জিলে শিল্পীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না।"

বাদশা বিস্মিত হলেন, উজিরকে সঙ্গে নিয়ে মতিমঞ্জিল উদ্দেশে যাত্রা করলেন। এসে দেখলেন শিল্পী অদৃশ্য। শিল্পী যে কক্ষে ছবি আঁকছিল সেই কক্ষে দুজনে প্রবেশ করলেন। দেখলেন

কেউ কোথাও নেই আপনার স্থানে পরদা ঢাকা চিত্রপট—তার দুপাশে রজতাধারে তৈলহীন প্রদীপ দুটিতে সল্‌তের ভস্মাবশেষ।

বাদশা চিত্রপট দেখে হৃষ্ট হলেন। বললেন—"উজির, চিত্রকর না থাক, চিত্রপট রয়েছে—তাই আমাদের যথেষ্ট। চিত্রকর যদি পুরস্কার প্রত্যাশা না করে সে দোষ ইরাণ-তুরাণের বাদশার নয়—"বলতে বলতে তিনি চিত্রপটের পরদা অপসারিত করলেন।

বাদশার মুখের কথা মুখেই মিলিয়ে গেল। দুজনে মন্ত্র-মুগ্ধের মত ছবির দিকে তাকিয়ে রইলেন। চিত্রপটে রত্নখচিত সিংহাসন যেমন আঁকা ছিল তেমনি আছে; কিন্তু তার উপরকার নতুন বেগমের চিহ্নমাত্র নেই।

রত্নসিংহাসনের রত্নগুলো যেন প্রাণ পেয়ে জ্বল্ জ্বল্ করছে।

ছোট উপকথা।

মানুষ ছিল একদিন অতি নির্ব্বোধ, তাই সে তার পাশের সঙ্গিনী-টিকে রেখেছিল কৃতদাসী ক'রে। তার পায়ে সে বেঁধে দিয়েছিল লোহার শিকল—এমনি একটু লম্বা যে ঘরের কাজে সে ফদিক ওদিক করতে পারে ; কিন্তু বাইরে দৌড়ে ছুটে না পালায়।

সঙ্গিনীটিও থাকত, ঠিক কৃতদাসীর মতই।

তার মনের কথা কে জানে ? মানুষের কুটীরখানি সে মেজে ঘসে ধুয়ে মুছে চকচকে ঝকঝকে করে রাখত। উঠানে নিজ হাতে তুলসীগাছ গোড়ায় প্রতি সন্ধ্যায় ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে সকল অমঙ্গলকে দূরে রাখবার প্রার্থনা জানাত। মানুষের ক্ষুধার আহার জুগিয়ে দিত, তৃষ্ণার জল এনে দিত, পূজোর ফুল সাজিয়ে দিত। মানুষ মনে মনে ভাবত, 'ও যে আমার জন্যে এত করে, তা আমি না হ'লে ওর চলে না বলে'।

মানুষের মনের কথা জেনে বিধাতা মনে মনে হাসলেন। তিনি মজা করবার জন্যে একদিন সঙ্গিনীটিকে তার পাশ থেকে সরিয়ে নিলেন।

মানুষ সে দিন কুটিরে ফিরে এসে দেখলে যে ক্ষুধার আহার নেই, তৃষ্ণার জল নেই, পূজোর ফুল নেই।

দেখে মানুষ একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি চেঁচিয়ে ঘর মাথায় করলে ; কার সঙ্গে কুরুক্ষেত্তর বাধাবে তা খুঁজতে লাগলে। এমন সময় বিধাতা এসে উপস্থিত হলেন। নিতান্ত ভাল মানুষটির মত জিজ্ঞেস করলেন—ব্যাপার কি ?

ব্যাপার কি ? মানুষ রেগে বলে উঠল,—ব্যাপার কি ? কোথায় গেল আমার সে ? ক্ষুধার আহার নেই, তৃষ্ণার জল নেই, পূজোর ফুল নেই, সেই যে সব করত।

বিধাতা বললেন—কেবল এই ?

মানুষ বললে—তা নয় ত কি !

বিধাতা বললেন—বেশ তুমি সবই ঠিক ঠিক পাবে। তোমার ক্ষুধার আহার, তৃষ্ণার জল, পূজোর ফুল, সব, কিছুরই ত্রুটি হবে না।

বিধাতার মন্ত্রগুণে মানুষ সব ঠিক ঠিক পেতে লাগল—তার ক্ষুধার আহার তৃষ্ণার জল পূজোর ফুল—সব ঠিক ঠিক আগেরই মত।

কিন্তু সঙ্গিনীটি আর ফিরলে না।

সেই ঠিক ঠিক সবই রইল—ক্ষুধার আহার, তৃষ্ণার জল, পূজোর ফুল, কিন্তু সেই সুরটি ত তেমন করে বাজে না। সেই সুরটি—যে সুরটি তার আহার ও পানের মাঝামাঝি বিচ্ছেদটুকুকে পূর্ণ করে রাখত, তার পান ও পূজোর মাঝামাঝি অবসরটুকুকে সন্তোষ আর তৃপ্তি দিয়ে ভরিয়ে দিত। আজ এ যে আহারের পিছনে কেবল আহারই আছে, জলের পিছনে কেবল জল, ফুলের

পিছনে কেবলই ফুল—মূর্ত্তিমতী নিষ্ঠুরতার মত, ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায়, হৃদয়হীন যন্ত্রের মত আপন আপন কর্ত্তব্য করে যায়।

বাইরের কাজ সেরে মানুষ সেদিন ক্লান্তদেহে তার কুটীরে ফিরে এলো, দেখলে সব ঠিক ঠিক সাজান,—তার ক্ষুধার আহার, তৃষ্ণার জল, পূজোর ফুল।

মানুষের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠল। কে চায়, কে চায় তোমার এ সব? কে চায়, কে চায় তোমার এই হৃদয়হীন বিদ্রূপ? কে চায়, কে চায় তোমার এই যন্ত্রচালিত নির্দ্দয়তা?

লাথি মেরে সে তার সমস্ত খাবার ছড়িয়ে দিল—জলের পাত্র উলটিয়ে দিল, ফুলের রাশি ছয়-নয় ক'রে দিল।

বিধাতা এসে উপস্থিত হলেন, বললেন—আবার ব্যাপার কি?

ব্যাপার কি? মানুষ ক্রুদ্ধস্বরে বললে,—ব্যাপার কি? কে চায় তোমার এ সব? নিয়ে যাও, নিয়ে যাও তোমার ওই হৃদয়হীন ভোগ-সামগ্রী। আমার তাকে ফিরিয়ে দাও।

বিধাতা হাসলেন। তার সঙ্গিনীটিকে আবার ফিরিয়ে দিলেন।

মানুষ সে দিন তার সঙ্গিনীটির পা থেকে লোহার শিকল খুলে নিয়ে তার হাত দুখানিতে সোনার কাঁকন পরিয়ে দিল, তার গলায় মুক্তাহার দুলিয়ে দিল, তাকে বক্ষে চেপে চুম্বন করে বললে—তুমি ত কৃতদাসী নও, তুমি যে পূর্ণা, তুমি অসম্পূর্ণকে পূর্ণ কর, তুমি শূন্যকে সম্পদশালী করে তোল, তুমি কৃতদাসী নও।

সে দিন মানুষ যে ফুল দিয়ে পূজো করতে বসল, সে ফুলের গন্ধে দেবতা জাগ্রত হয়ে উঠলেন।

একটা অসম্ভব গল্প।

—— ঃ০ঃ ——

চার বছরের বিয়ে-করা স্ত্রী রেবামিনি যখন আঠার বছর বয়সে সন্ন্যাস রোগে হঠাৎ মারা গেল, তখন আমার মনে হ'ল যেন আমার হৃদয়-বীণায় যে-কটা তার ছিল, সে-কটা একেবারে পট্ পট্ করে' ছিঁড়ে গেল। দুঃখ অনুভব করবার সুখটাও আমার আর রইল না।

সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় শ্মশান থেকে ফিরে এলুম। মনে হল কে আমার হৃদয়-বীণায় তারগুলো আবার চড়িয়ে দিয়েছে। আর সেখানে কে যেন সবগুলো তারে পূরবীর সুর বসিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বিশাল ক্রন্দনে সকল বিশ্ব সকল চরাচর ডুবিয়ে দিচ্ছে। সন্ধ্যার পাতলা আঁধার বিষাদ মেখে যেন বাদুড়ের পাখার মতো হয়ে উঠেছে। বাতাসে বাতাসে একটা ক্রন্দনের রোল ঘুরে ঘুরে আশ্রয়ের নিষ্ফল সন্ধানে ফিরছে। এ জগতে তার কেউ নেই, কিছু নেই—আছে যেন একটা স্বপ্নের স্মৃতি; কিন্তু সে স্বপ্ন যেন আজ উধাও হ'য়ে চলে' গেছে—সৃষ্টির একান্ত বাইরে।

শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে' দিলুম। এই সেই শোবার ঘর—এ আজ কত মিথ্যা। কিম্বা মিথ্যাও ত নয়, মিথ্যা হ'লেও ত বেঁচে যেতুম। এ যে সত্য মিথ্যার সেই মাঝখানটাতে, যেখানে সত্য আপনার অধিকার ছাড়তে চায় নি—আবার মিথ্যাও আপনার পূর্ণ দখল খুঁজে পায়নি।

টেবিলের উপরে আলো জ্বলছিল। আল্‌নাতে নিত্য ব্যবহারের কোঁচান দুখানা সাড়ী শুঁড়ে শুঁড়ে জড়িয়ে ঝুলচে। টেবিলের উপরে "নৌকাডুবি" বইখানা যতদূর পড়া হয়েছে সেই খানটা একটা চুলের কাঁটা দিয়ে চিহ্নিত হ'য়ে নিতান্ত পরিত্যক্ত ভাবে পড়ে' আছে। জড়বস্তুর কি অনুভব করবার ক্ষমতা আছে? আমার ত সেদিন ঠিক সেই রকমই মনে হ'ল। সিঁদূরের কৌটাটি অর্দ্ধেক খোলা অবস্থায় একটা ব্রাকেটের উপরে পড়ে' রয়েছে। আমার অন্তর থেকে কণ্ঠের মধ্যে কি যেন একটা বড় ড্যালা ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসতে চাইচে। আমি মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে' বিছানায় মুখ লুকিয়ে চার বছরের শিশুর মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলুম।

কিন্তু আপনারা সবাই জানেন যে, যে-ক্ষতি পূরণ হবার কোন দিনই সম্ভাবনা নেই, সে ক্ষতিকে ধরে' মানুষ চিরকাল থাকে না। সে ক্ষতির যে দুঃখ সে-দুঃখের বিরুদ্ধে মানুষের অন্তর থেকে একটা সংগ্রাম আপনা হ'তেই আরম্ভ হ'য়ে যায়। তাই আমারও অন্তরে যে দুঃখ একদিন অতি স্পষ্ট ছিল অতি সত্য ছিল, তা কালের অব্যর্থ প্রলেপে ধীরে ধীরে আবছা হ'য়ে উঠতে লাগল। তারপর এমন একদিন এলো যখন দেখলুম যে রেবামিনির স্মৃতি আছে কিন্তু তার জন্য দুঃখ নেই। আসলে যা রইল তা হচ্ছে অতীতকে নিয়ে একটা সেন্‌টিমেণ্টালিজ্‌ম্।

আপনারা হয়ত বলবেন, যে-দুঃখ যে-ক্ষতি জীবনে এমন স্পষ্টতম ছিল, সে ক্ষতি সে দুঃখের এমন পরিণাম মানুষের পক্ষে

লজ্জাজনক। কিন্তু মনে রাখবেন আমি আপনাদের উপন্যাস বলতে বসি নি —যা সত্যিই ঘটেছে তাই বলছি।

সে যা হোক্, রেবামিনি মারা যাওয়ার মাস আষ্টেক পর যখন মা আমায় আবার বিয়ে করবার জন্যে ধরে' বসলেন, সে সময়ে আমার অন্তরে বিয়ে করা সম্বন্ধে এমন একটা জোরের "না" ছিল না, যা সে-অনুরোধের বিরুদ্ধে খাড়া হ'য়ে দাঁড়াতে পারে। অবশ্য আমার বিয়ে করবার আগ্রহ যে একটুও ছিল, তা নয়। তবে আমি বিয়ে করলে মা যে সুখী হবেন এটা জানতুম। সুতরাং যেটার সম্বন্ধে আমার নিজের মনে একটা প্রবল "না" ছিল না, অথচ যেটা করলে মা সুখী হবেন—মার সে অনুরোধে আমি "হাঁ" "না" কিছুই করলুম না। মা-ও 'মৌনং সম্মতি লক্ষণং' ধরে' নিয়ে আমার দ্বিতীয় গৃহিণীর সন্ধানে লাগলেন। বাঙলা দেশে আর যারই অভাব হোক্ না কেন, আঠার থেকে আশী বছর পর্য্যন্ত যে-কেউ বিয়ে করতে চাক্ না কেন, কারোরই মেয়ের অভাব হয় না। আর বিশেষত আমার বয়েস ত তখন সবে আটাশ। ফলে বছর ঘুরতে না ঘুরতেই চঞ্চলার সঙ্গে আমার দ্বিতীয়বার বিয়ে হ'য়ে গেল।

বাঙালীর সমাজে পুরুষ নারীর মধ্যে এমন একটা কঠিন যবনিকার ব্যবধান আছে, যাতে করে বাঙালী তরুণ-তরুণী পরস্পরের কাছে যেমন রহস্যময় ও রহস্যময়ী, পৃথিবীর আর কোন দেশে তেমন নয়। বাঙলার নব দম্পতীর মধ্যে এই যবনিকাটি কতকটা অপসারিত হয়—শুভদৃষ্টির সময়ে নয়, বাসর ঘরে নয়,

বিয়ের সময়কার শত কোলাহলের মধ্যে নয়—সেটা হয় তাদের প্রথম রজনীর নিরালা মিলনে—প্রথম রজনীর সম্ভাষণে। সেদিন দূর কাছে আসে, রহস্য উন্মুক্ত হ'য়ে দৃষ্টির অতি নিকটে আসে—যা এতদিন চোখে পর্য্যন্ত দেখা যায় নি, তা একেবারে স্পর্শের সীমায় এসে পড়ে। সেই জন্যে এই রজনীটি বাঙালী তরুণ তরুণীর পক্ষে আশায় আকাঙ্ক্ষায় কৌতূহলে একেবারে পরিপূর্ণ।

আমার পুরুষের প্রাণ নারীর জন্যে অবশ্য তেমন সজাগ ছিল না, কেননা সে প্রাণের তন্ত্রী নারীর স্পর্শে একবার বেজে উঠেছিল, সেখানে আর সেই একই কারণে নতুন উন্মাদনা সৃষ্টির সম্ভব ছিল না। কারণ, মানুষের জীবনে একই বিষয়ের অনুভব দ্বিতীয়বার তেমন তীব্র ও তেমন তীক্ষ্ণ হয় না। অজ্ঞাত যা তার সম্মোহন যতটা, জ্ঞাত যা দখলে এসেছে, একবার যা জেনেছি তার মাদকতা ততটা নয়।

কিন্তু তাই বলে' ঐ যে একটি জীব যার সঙ্গে আমার চির-জীবনের সম্বন্ধ, তার সম্বন্ধে যে আমার কোনই কৌতুহল ছিল না, এটা যদি আপনারা মনে করেন, তবে আপনাদের পক্ষে মানুষের চিরন্তন প্রকৃতিকেই অস্বীকার করা হবে। তাই সেদিন যখন রাতের খাওয়া দাওয়া শেষ করে' পান চিবুতে চিবুতে শোবার ঘরে একখানা ঈজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে একখানা বাঙলা মাসিকের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে তার গালাগালির বহরটা একবার নির্ণয় করতে ব্যাপৃত ছিলুম, তখন যখন বাহিরের বারান্দা থেকে মলের একটা সলজ্জ টিনি

টিনি শব্দ আমার কাণে এসে বাজল, তখন আমার মনটা "মোহ-মুদ্গরের" শ্লোক আওড়াবার জন্যে মোটেই ব্যস্ত হয়ে উঠল না। এমনি সময়ে এমনি অবস্থায় ওমনি মলের শব্দ আরও একদিন আমার শোবার ঘরের সামনে ওমনি সলজ্জ হ'য়েই বেজেছিল; কিন্তু সেদিন ওই শব্দ শুনে আমার বুকের বাঁ পাশটা একেবারে অচেতন ছিল না, সেদিন ঐ মলের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আমার সামনে একটা নূতন জগতের রুদ্ধ কবাট অর্গলমুক্ত হবার আয়োজন করছিল। কিন্তু আজ আমার ও-জগতের সকল গানই শোনা হয়ে গেছে, আজ আবার নূতন একজন, যিনি গীত বহন করে' আমার হৃদয়ের দ্বারে আসছেন, জানি তাঁর সে গীতের সঙ্গে আমার সে শোনা গানের কোনই প্রভেদ থাকবে না—শব্দেও নয়, অর্থেও নয়, সুরেও নয়—যদি কিছু প্রভেদ থাকে ত, সে একমাত্র তালের।

মলের শব্দ ধীরে ধীরে আমার শয়ন-কক্ষের দরজার পাশে এসে থামল, সঙ্গে সঙ্গে একটা সুগন্ধি কেশ-তৈলের মৃদু স্নিগ্ধ ও মিষ্ট গন্ধ আমার ঘরটার ভিতরে চারিয়ে গেল, আমার নির্জীব ঘরটা যেন জেগে উঠল, আমিও সজাগ হয়ে ঈজি চেয়ারের উপরে উঠে বসলুম।

ঘরের দরজার পাশে মলের শব্দ থামার সঙ্গে সঙ্গে চুপি চুপি কি কথা আরম্ভ হ'য়ে গেল। বুঝলুম যে নববধূ একা আসেন নি। পর-ক্ষণে চঞ্চলাকে আমার ঘরের মধ্যে ঠেলে দিয়ে আমার ছোট বোন স্বর্ণ দুষ্টোমির হাসি হেসে বললে—"দাদা, এই রইল তোমার বউ, বুঝে পড়ে' নাও, যে লজ্জা মা গো মা!" সঙ্গে সঙ্গে আমার দরজাটাও বাহির থেকে সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল।

চঞ্চলার প্রতি আমার দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ হবামাত্র আমার বুকের মধ্যে সজোরে কি একটা টক্ করে' উঠল। একটা আন্কোরা স্প্রিংকে দাবিয়ে রেখে চট্ করে' ছেড়ে দিলে সেটা যেমন লাফিয়ে ওঠে তেমনি করে' আমি চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলুম। কে ও? কে ও? চঞ্চলা? না—না—ও তো রেবামিনি! এমনি প্রায় পাঁচ বছর আগে ওমনি একখানি গোলাপী রঙের শাড়ী পরে' অমনি অবগুণ্ঠন টেনে ওমনি ভঙ্গীতে ওমনি করে' আমার শোবার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল। চঞ্চলা? না—না—ও যে একেবারে হুবহু রেবামিনি—আমারই মিনি। আমি দৌড়ে গিয়ে মিনিকে বুকে তুলে নিলুম, তাকে বুকে করে' আলোর কাছে নিয়ে এলুম, একটানে মাথার ঘোম্টা ফেলে দিলুম, তারপর তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, না না, এ মিনি নয়, এ আর কেউ, আমি পাগলের মতো তৎক্ষণাৎ তাকে আলিঙ্গনমুক্ত করে দিলুম, এমনি করে' তাকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে দিলুম যে, চঞ্চলা তাল সামলাতে না পেরে একেবারে সজোরে টেবিলের উপরে পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আলোটা উল্টে পড়ে' দপ্ করে' নিভে গেল—আমি বাগানের দিককার দরজাটা খুলে বাইরে গিয়ে বাগানের একটা পাথরের বেঞ্চির উপরে বসে' পড়লুম। আমার ভিতরে তখন আগুন ছুটছে, শরীরের উপরে ঘাম ছুটছে। আমি তখন কে? শ্রীরামপুরের নবীন জমিদার শ্রীবিভূতিরঞ্জন রায়? না—আমি তখন একজন বদ্ধ পাগল, আমার আসল জায়গা হচ্ছে পাগ্লা-গারদে।

কেমন করে' কোথায় দিয়ে রাত কেটে গেল! যখন বাহ্য প্রকৃতির

জ্ঞান ফিরে এলো, তখন দেখলুম যে আমি তেমনি বেঞ্চির উপরে বসে' আছি, আর পূব আকাশে অন্ধকারের বুক্ চিরে আলো ফুটেছে। ভোরের হাওয়া বইতে সুরু করল, তার স্পর্শে আমার মাতাল মন কতকটা তাজা হ'য়ে উঠল। পূর্ব্বাকাশ ধীরে ধীরে লাল হয়ে উঠল। দিনের স্পষ্টতার মধ্যে রাত্রির ঘটনাটাকে একটা অতিদূর দুঃস্বপ্নের মতো প্রতীয়মান হ'তে লাগল, যেন সেটা আরব্য-উপন্যাসের একটা ছেঁড়া পাতা কোন ক্রমে উড়ে এসে আমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করেছিল।

কিন্তু আরব্য-উপন্যাসের ছেঁড়া পাতাই হোক্ আর দুঃস্বপ্নই হোক্, সে-রাত্রির কোন ঘটনা যে আমার মনের উপরে কোনই ছাপ রেখে গেল না তা নয়। আমি সেদিন স্পষ্ট বুঝলুম যে, মানুষের প্রতি-মুহূর্ত্তে যা তার স্পষ্ট, সেইটেই তার মিথ্যা। মানুষের মগ্ন-চৈতন্যের যে সত্য সে সত্য তার প্রবুদ্ধ চৈতন্যের সহস্র চাঞ্চল্যের কাছে প্রতি-নিমিষেই হার মানছে। কিন্তু যখন একটা কিছু ইঙ্গিতে একটা কিছু ইসারায় একটা কিছুকে নিমিত্ত করে' সেই মগ্ন-চৈতন্যের সত্য বাইরের মনে বেরিয়ে আসে তখন প্রবুদ্ধ চৈতন্যের হাজার চাঞ্চল্য পালাবার পথ পায় না। আমার সেদিন মনের পাতায় যে-একটা গভীর দাগ পড়েছিল এদাগ আগে থাকলে মা আমার কিছুতেই দ্বিতীয়বার বিয়ে দিতে পারতেন না—এটা ঠিক অনুভব করলুম।

তার পরদিন রাত্রে যখন চঞ্চলাকে সঙ্গে নিয়ে স্বর্ণ এসে আমার ঘরের সামনে দাঁড়াল তখন দেখলুম স্বর্ণর মুখ চোখ থেকে সে দুষ্টোমির হাসি কোথায় চলে' গেছে, তার ঠোঁটদুটো কি যেন একটা

অভিমানের আঘাতে কঠিন হ'য়ে উঠেছে, তার চোখ দুটো থেকে কি যেন একটা প্রশ্ন তীক্ষ্ণশরের মতো আমার পানে বেরিয়ে আসছে। স্বর্ণ বললে—"দাদা, তুমি আর যাকেই ফাঁকি দাও না কেন, আমার নতুন কাণ, নতুন চোখ, নতুন মনকে ফাঁকি দিতে পারবে না। তোমার বাগানের দিককার দরজায় আজ আমি বাহির থেকে শিকল এঁটে দিয়েছি —আর এ দরজারও তাই করব। যদ্দিন তুমি শিষ্ট হ'য়ে না ওঠো, তদ্দিন তুমি এমনি বন্দী অবস্থাতেই রাত কাটাবে।" স্বর্ণ চঞ্চলাকে ঘরের মধ্যে রেখে কবাট টেনে দিয়ে বাহিরের শিকলটা কড়ায় লাগিয়ে দিয়ে চলে' গেল।

অভাব্য যা, কল্পনারও অতীত যা, তাই যখন অপ্রত্যাশিত ভাবে দৃষ্টির আগে আসে তখন অসতর্ক মনে এমন একটা ওলোট পালোট হয়ে যায় যে মানুষ তখন স্বভাবতই সংযম হারিয়ে বসে; কিন্তু যে কল্পনাতীতের জন্যে মনকে প্রস্তুত করে' বসে' আছে তার কোন রকম অপ্রকৃতিস্থ হবার কারণ ঘটে না তাই আমি সেদিন চঞ্চলাকে নিরীক্ষণ করতে লাগলুম। দেখলুম চঞ্চলার সঙ্গে রেবামিনির সাদৃশ্য আমার উম্মাদ দৃষ্টির ভ্রান্তি একটুও নয়। সেই একই দাঁড়াবার ভঙ্গী, একই দেহের গঠন, একই উচ্চতা—সেই সবই এক। সেদিন চঞ্চলা একখানা হাল্‌কা সবুজ রঙের শাড়ী পরেছিল। বুঝলুম চঞ্চলার রেবামিনির সাদৃশ্যের কারণ আর যাই হোক্ না কেন তা শাড়ীর রঙের সাদৃশ্য নয়। এ সাদৃশ্য হয় চঞ্চলার দেহে, নয় আমার মনে।

চঞ্চলা দাঁড়িয়েই রইল। আমি ভীষণ অসোয়াস্তি বোধ করতে

লাগলুম। আমি যে কি করব, আমার যে কি করা উচিত, সেটা আমি কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিলুম না। আমি. যে অপরাধী, এ সত্য আমার মনের কাছে অতি স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল। গত রজনীর ঘটনার যে কোন কৈফিয়ত নেই কিম্বা থাকলেও সে কৈফিয়তটা যে আর যাকেই হোক্ চঞ্চলাকে দেবার মতো নয়, সেটা আমি জানতুম। যা হোক্ ও রকম অবস্থাটা যখন বেজায় অসহ্য হ'য়ে উঠল, তখন আমি নিতান্তই খাপছাড়া ভাবে বললুম—"চঞ্চলা এসো"।

চঞ্চলা অগ্রসর হ'ল, ধীরে ধীরে সঙ্কোচের সঙ্গে দ্বিধাজড়িত পদে। এ দ্বিধা নব-বধূর প্রথম সম্ভাষনের লজ্জা-প্রসূত নয়, এ দ্বিধা উদ্ভূত হয়েছিল তরুণ মনে আশাভঙ্গের যে নিষ্ঠুর আঘাত, সেই আঘাত থেকে।

আমি কিন্তু চঞ্চলার চলনটাই দেখতে লাগলুম। সে-চলা একেবারে হুবহু রেবামিনির চলনের মতো। রেবামিনি মৃত, একথা আমি যদি না জানতুম তবে আমি হলফ করে' বলতে পারতুম যে, এ মিনি—মিনি—মিনি ছাড়া আর কেউ নয়।

চঞ্চলা আমার কাছে এসে দাঁড়ালে আমি তার মাথার অবগুণ্ঠন ফেলে দিলুম। না, সকল সাদৃশ্য সত্ত্বেও এ রেবামিনি নয়। চঞ্চলা আমার দিকে তাকিয়ে দেখল, আমিও তার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, বড়বড় কালো কালো চোখ দুটি থেকে—উঃ সে কি দৃষ্টি! আমার মনে হ'ল কে যেন আমার হৃদপিণ্ডের দল্‌দলে তাজা রক্ত-মাংসের উপরে শঙ্কর মাছের লেজের চাবুক শপাং করে' বসিয়ে দিলে।

চঞ্চলার সে দৃষ্টি— সে-দৃষ্টিতে ভাষা ছিল, মিনতি ছিল, ছিল

একটা জীবনের প্রাণপণে দাবিয়ে-রাখা ক্রন্দন—যে জীবনের সুখের একই মাত্র আশালতা, যে আশালতা ছিঁড়লে জীবনে আর কিছু ধরবার থাকে না। আমি অনুভব করলুম জল্লাদের সঙ্গে আমার কোনই প্রভেদ নেই। আমার ত কোন কৈফিয়ত নেই। আমি চঞ্চলাকে পাশে বসিয়ে আদর করতে লাগলুম। চঞ্চলার চোখ দু'টো ছল ছল করে' উঠ্ল।

চঞ্চলার যে-হাতখানি নিয়ে আমি আদর করছিলুম সেই হাত-খানার প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ল— আমি চম্‌কে উঠলুম। রেবামিনির হাতের প্রত্যেক রেখাটি আমার চেনা। দেখলুম এ হাত ঠিক রেবার হাত। হাতের গড়ন, আঙুলের গড়ন, নখ সব অবিকল রেবামিনির হাতের মতো। চঞ্চলার বাঁ-হাতখানি নিয়ে তা উল্‌টিয়ে দেখলুম তার পিঠে অনামিকা আঙুলের উপরে তিলটি পর্য্যন্ত স্বস্থানভ্রষ্ট নয়। আমি বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে হাত দু'খানির দিকে চেয়ে রইলুম। চঞ্চলা অতি মৃদু কণ্ঠে সঙ্কোচের সঙ্গে বল্‌লে—"কি দেখছ?" চঞ্চলাকে আমি উত্তরে ফাঁকি দিলুম। আমি বললুম—"আমার স্বভাব এমনি যে, আমার মানুষের হাতের সঙ্গেই ভালবাসা আগে হয়। তোমার হাত দুখানি অতি সুন্দর।" চঞ্চলার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তার ঠোঁট দু'খানিতে একটু মৃদু হাসির রেখা অঙ্কিত হ'তে চেয়ে চেয়ে মিলিয়ে গেল; কারণ তার প্রাণ থেকে শঙ্কা বুঝি তখনও একেবারে অন্তর্হিত হয় নি। কিন্তু সে দিন সে রাত্রে আমার অন্তরে সব চাইতে যেটা গভীর দাগ কেটেছিল সেটা হচ্ছে আমার পানে চঞ্চলার প্রথম দৃষ্টিটি। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম

আমার অন্তরে যাই হোক্ না কেন চঞ্চলার যেন দুঃখের কারণ আমি না হই। চঞ্চলাকে সুখী করবার জন্যে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করব।

স্বর্ণ তার শ্বশুর বাড়ী চলে' গেল, আমরা স্বামী-স্ত্রীতে যেমন সবাই দিন কাটায় তেমনি দিন কাটাতে লাগলুম! কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল ততই আমার মনে একটা ভাব স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হ'য়ে উঠতে লাগল। সে ভাবকে আমি যতই ছাড়াতে চাই সে ভাব আমাকে ততই জড়িয়ে ধরতে লাগল। আমার সুখ সোয়াস্তি কোথায় উড়ে গেল। আমার ভিতর ও বাহির একটা বিরাট মিথ্যা সম্বন্ধের উপরে প্রতিষ্ঠিত হ'ল। এ মিথ্যা আমার চাইতে শক্তিমান। এ মিথ্যার হাত থেকে হায় আমার উদ্ধারের আর বুঝি উপায় নেই।

পলে পলে তিলে তিলে আমার মনে প্রাণে যেন আমার প্রত্যেক স্নায়ূতে স্নায়ূতে অতীতের একটি রহস্যময় অতি সূক্ষ্ম প্রভাব বিছিয়ে পড়তে লাগল যে-প্রভাবের সামনে চঞ্চলার অস্তিত্ব, চঞ্চলার স্বাতন্ত্র্য, আমার কাছে প্রতিদিনে অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল। ঐ প্রভাবের মধ্যে আমার সুখ ছিল, বেদনা ছিল, আমার বিদ্রোহ ছিল আবার আনন্দও ছিল। অতীতের অস্পষ্টতার কাছেই বর্ত্তমানের স্পষ্টতা প্রতি নিমিষে হার মানতে লাগল।

আমি আদর করতুম—কাকে? চঞ্চলাকে? না—সে-আদর যেন কোন্ অদৃশ্য লোকের কোন অদৃশ্য-শরীরী জীব এসে দাবী করে' কুড়িয়ে নিয়ে যেত, সে আদর চঞ্চলার শরীরের উপরেই থেকে যেত তার অন্তরে ত পৌঁছিত না, সে আদর করবার সময় ত আমার

চঞ্চলাকে মোটেই মনে পড়ত না—মনে পড়ত রেবামিনিকে, তার প্রতিদিনের কথাগুলিকে, তার বিশেষ বিশেষ দিনের অভিমান-গুলিকে; তার সোহাগ আদর হাস্য পরিহাস, এই সব একত্র হ'য়ে দল বেঁধে এসে আমার মনের উপরে পড়ে' সেখান থেকে অতি স্পষ্ট অতি বর্ত্তমান চঞ্চলাকে কোথায় নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখত—ঠিক আমি যখন চঞ্চলাকে নিয়ে আদর করতে বসতুম। হায়! এর বিরুদ্ধে আমি কেমন করে' লড়াই করব।

কিন্তু আর যাকেই হোক্ না কেন বাইরের মিথ্যা আচরণ দিয়ে আপনার জনকে চিরকাল ফাঁকি দেওয়া যায় না। যে দুটি মানুষ চব্বিশ ঘণ্টা এক বাড়ীতে রয়েছে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কুড়ি ঘণ্টাই হয়ত যাদের বাক্য দৃষ্টি স্পর্শ পরস্পারের মধ্যে বিনিময় হচ্ছে, বিশেষত যে দুজনের অন্তত একজনও আর একজনের অতি আপনার অতি অন্তরতম হবার জন্যে ব্যগ্র—এমন যে দুটি মানুষ—এদের পরস্পারের মনের সঙ্গে এমনি একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হ'য়ে যায় যাতে করে' সে দুটো মন বাইরের মিথ্যা আচরণে কিছুতেই প্রতারিত হয় না। বাইরের সকল অনুষ্ঠানকে কাটিয়ে এদের এক জনের মনের ভাব আর এক জনের মনে প্রতিফলিত হয়ে যায়।

তাই চঞ্চলা এটা স্পষ্ট করে' না জানলেও এ অনুভবটা বোধ করতে তার বিশেষ বিলম্ব হ'ল না যে, আমার অন্তরাত্মা তার অন্তরাত্মাকে মোটেই বরণ করে' নিতে পারে নি, একান্ত সামীপ্য সত্বেও আমাদের দু'জনের মধ্যে এমন একটা বাধা এমন একটা ব্যবধান আছে যা কি করলে ভাঙ্গে কি করলে ঘোচে তা তারও জানা

ছিল না—আমারও জানা ছিল না, আর তা ভাঙ্গবার আমার ইচ্ছাও ছিল না—শক্তিও ছিল না।

ধীরে ধীরে চঞ্চলা সম্বন্ধে আমার মনে দুটো ভাব বাসা বাঁধল, দুটো পরস্পরের ঘোর বিরোধী! একটা তার প্রতি প্রবল আকর্ষণ, আর একটা তার বিরুদ্ধে ঠিক তেম্‌নি প্রবল বিদ্রোহ। চঞ্চলার যেটুকু মিনির মতো, তার দেহের ভঙ্গিটি, তার হাত দুখানি—তাই ছিল আমার প্রতিদিনের সম্বল। তার দুখানি হাত আমি যখন ধরে' থাকতুম, তখন কি একটা মাদকতায় আমার চিত্ত মন ভরে' উঠত, কি একটা স্বপ্নে আমার সমস্ত বর্ত্তমান মুছে যেত, রেবামিনির চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে যেন তার একটা সূক্ষ্ম সান্নিধ্য আমি বোধ করতুম—আর সেই সময় একটা গভীর শান্তিময় তৃপ্তিতে আমার অন্তরাত্মা পূর্ণ হ'য়ে উঠত, যেন এ জগতে আর আমার কিছুই করবার বাকি নেই, ভগবানের দেওয়া এই জীবনের সকল ঋণই যেন আমার শোধ হ'য়ে গেছে, জীবনের শেষ কথাটি যেন আমার বলা হ'য়ে গেছে। কিন্তু যখন চঞ্চলার মুখের দিকে আমার নজর পড়ত, তখন আমার সে স্বপ্নের জগত মুহূর্ত্তে কোথায় মিলিয়ে গিয়ে তার বিরাট অনৃতত্ব আমায় দেখিয়ে দিত। ঐ মুখখানাই ত যত নষ্টের মূল। হায়! ঐ মুখখানা যদি মিনির হ'ত! ধীরে ধীরে চঞ্চলার মুখের প্রতি একটা অতি রুদ্র অবজ্ঞা আমার মনকে প্রাণকে চিত্তকে বিষময় করে' তুল্‌ল। চঞ্চলাকে আমি ছাড়তে পারতুম না—কিন্তু সে ত চঞ্চলার জন্যে নয়।

কিন্তু আমার ঐ মনের ভাব চঞ্চলার মনে গিয়ে আঘাত করতে

কিছুমাত্র দেরী করল না। চঞ্চলা আর আমার কাছে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করতে চাইত না। আমিও তা কোনদিন খুলতে বলতুম না বা খুলতুম না। কোন অধিকারে?—এমনি করে' দিনের পর রাত, রাতের পর দিন কেটে যেতে লাগল,—সদা-অবগুণ্ঠনবতী চঞ্চলাকে দেখে আমার বুকের মধ্যে মাঝে মাঝে একটা বিদ্যুতের ঝলক উঠত—এ চঞ্চলা? না রেবামিনি?—

আপনাদের মনে কোনদিন বিদ্রোহের ভাব জেগেছে? বিদ্রোহ সংসারের উপরে সৃষ্টির উপরে ভগবানের উপরে। যেন এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে কিছুই ঠিক চলছে না—এর আগা থেকে গোড়া পর্য্যন্ত সব উল্টো, এর সুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত কেবল একটা বিশৃঙ্খলার জটলা। এখানে কারো বুদ্ধি নেই, বিবেচনা নেই, হৃদয় নেই, দয়া নেই, করুণা নেই, কিছুই নেই—আছে কেবল নিষ্ঠুর মরুভূমির ধূ-ধূ-ধূসর তপ্ত বালির চোখজ্বালা-করা শুভ্রতা। কিন্তু কেন? কারণ ঐ যে প্রশ্ন—এ চঞ্চলা, না রেবামিনি? এর উত্তর একটা বিরাট মিথ্যা।

আমার প্রতিদিনের নিষ্ঠুর অত্যাচার তার অন্তরাত্মার বিরাট অপমান সম্বল করে' চঞ্চলা শুকিয়ে উঠতে লাগল। এ থেকে বুঝি তার মুক্তি নেই, সে মন্ত্রমুগ্ধ বিহঙ্গিনীর মতো ধীরে ধীরে বুঝি মরণের দিকে অগ্রসর হ'য়ে চলল, আর সেই সঙ্গে মিনির জন্যে আমার রাক্ষসী আকাঙ্ক্ষা প্রবল হ'য়ে উঠতে লাগল। এই রাক্ষসী আকাঙ্ক্ষার কতকটা তৃপ্তির জন্য আমার ছিল দরকার চঞ্চলাকে। ক্রমে ক্রমে আমার মনের দ্বিধা দ্বন্দ্ব সব ঘুচে গেল, চঞ্চলা যে একটি জীব, তার যে একটা পৃথক জীবন আছে, যে জীবনে সুখ

দুঃখ বোধ আছে, আশা আকাঙ্ক্ষা আছে, তা আমি ভুলে গেলুম। চঞ্চলার দিনগুলো একটা অন্তহীন দুঃখের ভিতর দিয়ে ব'য়ে যেতে লাগল। হায়! এর থেকে তার মুক্তি কিসে হবে? কবে হবে?—

এমনি করেই দিন কাটতে লাগল। একদিন রাত্রে মিনিকে ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়লুম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলুম যে, মিনি আমার বিছানার পাশে এসে হেসে কুটি কুটি হ'য়ে আমায় বলছে—"এই দেখ আমি আবার এসেছি, তুমি কি ঘুমিয়েই থাকবে?" আমার ঘুম তখনই ভেঙ্গে গেল। দেখলুম কেবল অন্ধকার, আর আমার পাশে একটা অতি মৃদু কান্নার শব্দ। চঞ্চলা কাঁদছিল।

হায়! আমি চঞ্চলাকে কি বলে' সান্ত্বনা দেব। সে যে হবে ঘোর মিথ্যা! আমার মুখের কথা কি তার প্রাণে লাগবে? আমার অন্তরাত্মায় যার চিহ্নমাত্র নেই, তারি ফাঁকা মুখের কথায় কি তার অন্তরাত্মায় শান্তি ঢেলে দেবে? আমি জানতুম তা দেবে না। তাই আমি কিছুই বলতে পারলুম না। কি জানি কত রাত চঞ্চলা এই রকম কেঁদে কাটিয়েছে!

এমন সময় মা আমার কবাটে আঘাত করে' ডাকলেন। আমি জেগেই ছিলুম। উত্তর দিলে মা বললেন—"দেখত কার মোটর এসে আমাদের বাড়ীর গেটের কাছে লাগল।"

মোটরের শব্দটা আমারও কানে এসে লেগেছিল কিন্তু আমি সেদিকে তত মনোযোগ দিইনি। যখন মা বললেন যে, সেটা

আমাদেরই বাড়ীর গেটের কাছে এসে লেগেছে তখন আমি তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে বেরিয়ে পড়লুম।

বাইরে গিয়ে দেখলুম আমার শ্বশুর বাড়ীর—চঞ্চলার বাপের বাড়ীর—মোটর, সোফরের হাতে এক চিঠি। চিঠি পড়ে' জানলুম যে চঞ্চলার বাবা অত্যন্ত পীড়িত, এখন যায় যায় অবস্থা, ডাক্তারের মতে আজ রাত কাটে কি না সন্দেহ, চঞ্চলাকে দেখবার জন্যে তিনি ব্যাকুল, কেবলই চঞ্চলাকে ডাকছেন, চঞ্চলাকে ফিরতী মোটরে পাঠাবার ব্যবস্থা করবার জরুরি অনুরোধ।

আমি তাড়াতাড়ি মা'কে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে, চঞ্চলার গায়ে একটা শাল জড়িয়ে দিয়ে দু'জনে গিয়ে মোটরে চড়লুম। মোটর ঝড়ের বেগে ছুটে চলল।

ভোর হয় হয়—হ্যারিসন রোডের গ্যাসের বাতিগুলো কেবল নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের মোটর আমহার্স্ট ষ্ট্রীটে চঞ্চলার বাপের বাড়ীর সামনে গিয়ে লাগল। মোটর থামার সঙ্গে সঙ্গে আমার শ্যালক অমূল্য এসে চঞ্চলাকে নিয়ে গেল, আমি বৈঠকখানায় অপেক্ষা করতে লাগলুম।

পাঁচ মিনিটও হয় নি, তখন উপরে বাড়ীর ভিতরে একটা চাঞ্চল্যের আভাস পেলুম। সঙ্গে সঙ্গে অমূল্যর উত্তেজিত কণ্ঠ আমাকে ডাকলে "বিভূতি বাবু, বিভূতি বাবু, একবার উপরে আসুন।" আমি তাড়াতাড়ি উপরে উঠে গেলুম।

যে ঘরে রোগী ছিল সেই ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলুম, দেখলুম চঞ্চলা অবগুণ্ঠন-হীনা রোগীর শয্যার পাশে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে।

রোগী বিছানার উপরে উঠে বসেছে। তার শীর্ণ মুখমণ্ডলে কোটরগত চোখ-দুটো কেবল যেন কোন অদৃশ্যলোকের তীব্র ও তীক্ষ্ণ আলোকের সম্পাতে জ্বল্ জ্বল্ করছে। আমি ঢুকতেই রোগী হতাশ কণ্ঠে বললেন, "এ কাকে নিয়ে এলে বাবা, এ ত আমার চঞ্চলা নয়।"

আমি আমার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে দেখলুম—ওঃ কি দেখলুম !!!

মুহূর্ত্তে—বোধ হয় এক সেকেণ্ডের সহস্রাংশের এক অংশ সময়ের জন্যে আমার ধমনীতে ধমনীতে সমস্ত রক্ত-চলাচল বন্ধ হ'য়ে গেল, তার পর-মুহূর্ত্তে সেই রক্ত-প্রবাহ আবার আমার সর্ব্বাঙ্গে ছেয়ে গিয়ে আমাকে উন্মাদের মতো করে' তুলল, ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূলের মতো আমি চক্ষের পলকে গিয়ে আমার স্ত্রীকে আমার বুকের উপরে চেপে ধরলুম। কি একটা বিজয় গর্ব্বে আমার সমস্ত অন্তর উথলে-ওঠা সাগর-বারির মতো স্ফীত হয়ে উঠল, আমি রোগীর দিকে চেয়ে এক হাত তুলে যেন আমার সম্মুখীন মৃত্যুর অসীম শক্তিকে লক্ষ্য করে' চ্যালেঞ্জের স্বরে চেঁচিয়ে বলে' উঠলুম—"না এ আপনার মেয়ে চঞ্চলা নয়—এ আমার স্ত্রী রেবামিনি"।

মরণাহত রোগী বিছানার উপরে ঢলে' পড়ল। আমি সে দিন আমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে প্রথম চুম্বন করলুম।

একটি সত্যি গল্প।

— :০: —

উচ্ছল উদ্দাম পার্ব্বত্য ঝরণা হু হু শব্দে পাহাড়ের গা দিয়ে ছুটে চলেছে—যেন সে জানিয়ে দিতে চায় যে, এ জগতে গতির চাইতে বড় সত্য আর কিছু নেই। সেই ঝরণার ধারে একটুখানি সমতল জায়গার উপরে ছোট্ট একটি কুটীর—আর সেই কুটীরে বাস করত এক তরুণ পাহাড়ি। তরুণ পাহাড়ির দিনমান কোনই কাজ ছিল না—সে তার কুটিরের চার পাশ বন্য গোলাপের গাছে গাছে ভরে' তুলেছিল—বন্য গোলাপ আরও কত রকমের ফুল লতা পাতা দিয়ে তার কুটীর খানিকে কুঞ্জবনের মত করে' তুলেছিল। দিনমান সে সেই ফুল লতা পাতার চর্চ্চা করেই কাটিয়ে দিত—কেবল সকাল বেলায় যখন প্রভাতী সূর্য্যের আলোর স্পর্শে পাহাড়ের গায়ের বরফ চিক্‌মিক্ করে' উঠত তখন সে একবার সেই ঝরণাটির ধারে গিয়ে উপস্থিত হ'ত। সেখানে গিয়ে ঝরণার অপর দিকে বহুক্ষণ ধরে চেয়ে থাক্‌ত, যেন কার আসবার কথা আছে—যেন সে কার অপেক্ষায় সেখানে কুটীর বেঁধে রয়েছে। কিন্তু সারাবেলা দেখে দেখে যখন মাথার উপরে উঁচু পাহাড়ের বরফের সোনালি রঙ্ চলে' গিয়ে তা রূপোলি রঙে ঝিক্ ঝিক্ করে' উঠ্‌ত তখন সে একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে কুটীরে ফিরে আস্‌ত—আবার ফুলগাছগুলোর তত্ত্বাবধান, পরিচর্য্যা কর্‌ত।

এমনি করে কিছু দিন কেটে গেল! একদিন তাকে আর অমনি ফিরে আস্‌তে হ'ল না। সে ঝরণার ধারে গিয়ে দেখ্‌লে যে অপর পারে একটা পাথরের উপরে চুপ করে' বসে রয়েছে এক সুন্দরী তরুণী, যেন পাষাণ ফেটে পদ্মফুল ফুটেছে।

মুহূর্ত্তে পাহাড়িকে কে যেন বলে' দিয়ে গেল যে এ সেই—যার অপেক্ষায় সে প্রতিদিন ঘুরে বেড়াত। মুহূর্ত্তে পাহাড়ির অন্তরটা সার্থকতায় ভরে' উঠ্‌ল—তার চোখে পলক পড়্‌ল না—অনিমেষ নয়নে সে দেখতে লাগল সেই সুন্দরী অপরিচিতা তরুণীকে।

অচেনা? অচেনা ত বটেই; কিন্তু তার মত চেনা ত আর কেউ নেই—আর কিছু নেই। বর্ষে বর্ষে দিনে দিনে পলে পলে তারই অন্তরের সঙ্গে সঙ্গে যে সে গড়ে' উঠেছে—তারই আনন্দের ভিতর দিয়েই যে তরুণীর সঙ্গে তার পরিচয়। এ পরিচয় ত এক দিনের নয়—এক কালের নয়—এ পরিচয় যে বহু দিনের, বহু কালের—কত জন্মের। অচেনাই বটে—কিন্তু অতি অন্তরতম।

পাহাড়ি জিজ্ঞেস করল—"ওগো তরুণি, তোমার নামটি কি? তুমি আসছ কোথা থেকে?

তরুণী উত্তর দিলে—"নাম আমার তরুণী—অস্‌ছি আমি বহুদিন হ'তে—বহুদূর থেকে।"

"বহুদিন হ'তে?—তবে ত তুমিই সেই—যার অপেক্ষায় আমি এতদিন কাটিয়েছি। বহুদূর থেকে!—তাই বুঝি আমি দিগন্তের কোলে কোলে তোমারই পায়ের নূপুরের গুঞ্জন শুন্‌তে পেতুম—ঐ দূর বনান্তরাল থেকে যে বাতাস বয়ে' আস্‌ত তাতে তোমারই কুন্তলের

সুরভী-ঘ্রাণ পেতুম—ঐ ঊর্দ্ধে বহুদূরে সুনীল গগনে তোমারই নীল নয়নের অসীম দৃষ্টির গভীরতা আমার চোখে ধরা পড়্‌ত। তবে ত তুমিই সেই—তবে ত তুমি আমার-ই। ওগো তরুণি, আমাদের মিলন হবে কেমন করে? ওপার ছেড়ে এ পারে আস্‌বে না কি—?"

"তোমার নামটী কি?"

"নাম আমার কল্পশেখর।"

"কল্পশেখর, তোমার সাধ্য কি আমায় ধরে' রাখবে তোমার ঐ ছোট্ট কুটীরে—তোমার ঐ ছোট্ট কুটীরে ত আমার জায়গা হবে না। আর এই খরস্রোতা নির্ঝরিণীকেই বা আমি পেরিয়ে যাব কেমন করে—এ স্রোত যে মত্ত-মাতঙ্গকেও ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তার চাইতে কল্পশেখর, তুমিই এধারে এস। ওধারে ঐ কুটীর তোমার গণ্ডী। কিন্তু এধারে ত কোন গণ্ডী নেই—এধারে দিগন্তের আলো, দিগন্তের বাতাস। সার দিয়ে ঐ যে পাহাড়ের পর পাহাড় অনন্ত যুগ ধরে' মৌন হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে—সেই অনন্ত যুগের স্বপ্ন এধারে। ঐ অনন্ত যুগের স্বপ্ন নিয়ে অনন্ত যুগের সাক্ষী হ'য়ে যে পাহাড়গুলো দাঁড়িয়ে আছে তার আশে পাশে ভিতরে বাহিরে উপরে নীচে কত পথ কত অপথ—কত উপত্যকা অধিত্যকা—কত অসমাপ্তি। এই পথ অ-পথ ধরে' উপত্যকা অধিত্যকার ভিতর দিয়ে এই অসমাপ্তির দিকেই আমরা যাত্রা কর্‌ব, কল্পশেখর—তুমিই ওধার ত্যাগ করে এধারে এস না।"

"তবে তাই আস্‌ব তরুণী।"

কল্পশেখর জলে নাম্‌ল। তৎক্ষণাৎ অনুভব করলে যে তাকে

নির্ঝরিণীর খরস্রোত কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেল্‌বে। কল্পশেখর তাড়াতাড়ি জল ছেড়ে উঠে নির্ঝরিণীর তটে দাঁড়ালে। সাধ্য কি মানুষের এই খরস্রোতা অগভীর নির্ঝরিণী পায়ে হেঁটে পার হয়।

কল্পশেখর বল্‌লে—"শোনো তরুণী, মানুষের সাধ্য নেই এই খরস্রোতা নির্ঝরিণী হেঁটে পার হয়। শোনো, আমরা দুজনে এই ঝরণা ধরে' উজানের দিকে চলে যাই। যেখানে এর পরিসর স্বল্প হবে সেখানে এটাকে আমি ডিঙ্গিয়ে যাব।" তরুণী বল্‌লে—"আচ্ছা চল।"

দু'জনে দু'পার দিয়ে ঝরণার উজানে যাত্রা করল।

দু'জনে ধীরে ধীরে চল্‌তে লাগ্‌ল। ধীরে ধীরে সোনালি সূর্য্য পূব গগনে উঠে মাঝ গগনে গিয়ে পড়ল—আবার সেখান থেকে ক্লান্ত দেহে রাঙ্গা মুখে পশ্চিমে ঢলে' পড়ল, কিন্তু ঝরণা তেমনি হুহু শব্দে ছুটে চলেছে, কোনখানেই তার পরিসর এমন সঙ্কীর্ণ হয় নি যে, কল্পশেখর তা ডিঙ্গেয়ে যেতে পারে। সন্ধ্যা যখন তার কাজল আঁখি নিয়ে, তার কালো আঁচল আকাশে উড়িয়ে প্রকৃতিকে নিস্তব্ধ হ'তে ইঙ্গিত করল তখন তরুণী ব্যথিত কণ্ঠে ডাক্‌ল—"কল্পশেখর।"

"কি ?"

"আর ত আমি হাঁট্‌তে পারিনা, কল্পশেখর।"

কল্পশেখর বল্‌লে—"তবে আজকার মত আমাদের যাত্রা শেষ। শোনো তরুণী, এইখানে আমরা দু'জনে রাত কাটাব। তারপর প্রভাত হ'লে আবার চল্‌ব।"

তারা সেইখানে নির্ঝরিণীর দু'ধারে দু'জনে শ্রান্ত দেহে বসে পড়ল, দু'জন দু'জনের দিকে চেয়ে রইল। চারিদিকের স্তব্ধতার বুক চিরে হুহু শব্দে উদ্দাম উচ্ছল ঝরণা তাদের দুজনার মাঝ দিয়ে একটা অনন্ত বাধার মতো অক্লান্ত বেগে ছুটে চল্‌ল।

ধীরে ধীরে চারিদিকে আঁধার নিবিড় হয়ে এল, সুন্দরীর নীলাঞ্চলে চুম্‌কির মতো, নীলাকাশে লক্ষ তারা জ্বল্ জ্বল্ করে' উঠ্‌ল। কৌতূহলী হয়ে বুঝি তারা মুখর ঝরণার দু'পাশে "এই দুটী মৌন প্রাণীকে দেখ্‌তে লাগল। কি চায় এরা? কোন মরীচিকার পিছনে ছুটে চলেছে এরা? পরিণাম কি হবে এদের? তাই বুঝি তারা পরস্পরের মাঝে বলাবলি করতে লাগ্‌ল।

তার পরদিন প্রভাত হলে তারা আবার চল্‌তে লাগ্‌ল—কিন্তু যেমন ঝরণা তেমনি, কোথাও একটু সংকীর্ণ হয় নি, কোথাও তার গতিবেগ একটু মন্দ হয় নি—এ যেন অনন্ত কালের পথে অনাদি কাল থেকে ছুটে চলেছে। আবার সন্ধ্যা হল আবার নীলাকাশে লক্ষ তারা জ্বল্ জ্বল্ করে উঠল। আবার তারা বিশ্রাম করতে বস্‌ল।

পরদিন প্রভাতে আবার তারা চল্‌তে লাগ্‌ল, তার পরদিন—তার পর দিন, এমনি করে তারা চল্‌তেই লাগ্‌ল। যতই তাদের আশা ব্যর্থ হচ্ছিল—ততই তাদের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠ্‌ছিল যতই তাদের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হচ্ছিল ততই তাদের উৎসাহ উত্তম অদম্য হয়ে উঠ্‌ছিল। এমনি করে কত দিনের পর রাত, রাতের পর দিন কত উপত্যকা অধিত্যকা অতিক্রম করে, কত পর্ব্বত-চূড়া প্রদক্ষিণ করে তারা সেই পার্ব্বত্য ঝরণার উজানে চল্‌ল।

কিন্তু সে ঝরণার কোন পরিবর্ত্তন নেই—একই গতি, একই পরিসর, কোথায়ও এমন অবসর নেই যেখানে কল্লশেখর তা ডিঙ্গিয়ে যেতে পারে, সাহস করে উল্লম্ফনের চেষ্টা করতে পারে। এমনি করে পাঁচটী বৎসর কেটে গেল।

সেদিনও তারা চল্‌ছিল, হঠাৎ নির্ঝরিণীর হুহু শব্দকে ডুবিয়ে ছাপিয়ে এক বিশাল গর্জ্জন তাদের কানে এসে বাজল। যেন সহস্র প্রভঞ্জন এ সৃষ্টিকে ছিঁড়ে ফেলবার জন্যে সহস্র দিকে একসঙ্গে ছুটেছে—যেন সপ্ত সিন্ধুর লক্ষ ঊর্ম্মি সহসা ক্ষিপ্ত হয়ে একসঙ্গে পৃথিবীর পায়ে এসে মাথা খুঁড়ছে। কল্লশেখর একটু থেমে তরুণীকে বল্‌লে—"তরুণি শুন্‌ছ ?"

"শুন্‌ছি।"

"কিসের শব্দ এ ?"

"বুঝি মহাপ্রলয়ের ?"

"অগ্রসর হবার সাহস আছে ?

"তুমি যেখানে যাবে সেখানে আমার ভয় নেই।"

"তবে চল।"

দুজনে আবার চল্‌তে লাগ্‌ল। তারা যতই অগ্রসর হতে লাগ্‌ল ততই সে গর্জ্জন প্রবল হতে প্রবলতর হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। অবশেষে তারা সেই বিশাল গর্জ্জনের কারণ আবিষ্কার করল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের চলাও বন্ধ হল। কিন্তু হায় তাদের যাত্রা শেষ হল না ?

তারা যেখানটায় এসে পড়্‌ল সেখানে তাদের সাম্‌নে বিশাল

প্রাচীরের মত এক খাড়া পাহাড় আপনার মাথা তুলে রয়েছে—একেবারে খাড়া—দক্ষিণে বামে যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূর এই খাড়া পাহাড়। উপরে তাকিয়ে তার উচ্চতার শেষ দেখা যায় না। যেন বিশ্বকর্ম্মা পৃথিবীর সকল কৌতূহলের, সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার বাধা স্বরূপ যোজন-দীর্ঘ যোজন-উচ্চ এক খাড়া প্রাচীর তৈরী করে এখানে বসিয়ে দিয়েছেন। পৃথিবীর মানুষের এখানেই গতির শেষ—আর অগ্রসর হবার উপায় নেই। আর সেই পাহাড়ের মাথার উপর থেকে একটি প্রকাণ্ড জল-প্রপাত বিরাট গর্জ্জন করে' এসে পড়্ছে। এই প্রপাতই সেই ঝরণা হ'য়ে বয়ে গিয়েছে যার তীরে তীরে তারা এই পাঁচ বৎসর হেঁটে এসেছে। এই প্রপাতের শব্দই পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে চতুর্গুণ শব্দে তাদের কানে এসে বাজ্ছিল। তারা সেই প্রপাত ও নির্ঝরিণীর সঙ্গম স্থলে নির্ঝরিণীর দু'পারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কল্পশেখর ভাব্তে লাগ্ল।

এতদিন অন্তত তাদের মিলনের চেষ্টা কর্বার উপায় ছিল, আজ তারও শেষ। হয় মিলন, নয় মিলনের চেষ্টা। চেষ্টাও যখন অসম্ভব তখন জীবনে কাজ কি? কিন্তু এত সহজেই নিরস্ত হব? প্রথম বাধাতেই আ-জীবনের সাধনা পরাজয় মান্বে? অসম্ভব! কল্পশেখরের অন্তর দেবতা ত তা মান্তে চায় না। এই দুরারোহ পাহাড়ে ওঠ্বার কি কোন উপায় নেই—কোন পথই নেই? এই জলপ্রপাতেই নির্ঝরিণীর উৎপত্তি। সুতরাং সেখানেই এর শেষ। এই পাহাড়ের ওপরেই তাদের যাত্রা

শেষ হবে—তাদের মিলন হবে। কল্পশেখর তার বামে দক্ষিণে তাকিয়ে দেখ্‌ল। যতদূর দৃষ্টি চলে খাড়া পাহাড় পূর্ব্বে পশ্চিমে আপনাকে বিস্তার করে' নিষ্ঠুরতার প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে। যেন বল্‌ছে—মানুষ, তোমার আশা আকাঙ্ক্ষা কল্পনা জল্পনা উদ্যম উৎসাহের এইখানে শেষ—যাও ধরিত্রীর সন্তান আপনার মাতৃক্রোড়ে ফিরে যাও।

এমন সময়ে সেখানে এক অপূর্ব্ব সুন্দর পুরুষের আবির্ভাব হ'ল। বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সে একবার কল্পশেখরকে আরবার তরুণীকে দেখ্‌তে লাগ্‌ল—যেন তাদের সেখানে উপস্থিতির অর্থ সে কিছুই খুঁজে পাচ্ছিল না। অবশেষে সে কল্পশেখরকে সম্বোধন করে' বল্‌লে—"তুমি কে?"

"আমি মানব।"

তরুণীর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস কর্‌ল—"তুমি কে?"

"আমি মানবী।"

"কোথা থেকে আসছ তোমরা?"

কল্পশেখর বল্‌লে—"আমরা আস্‌ছি সেই দেশ থেকে, যেখানে ফুল ফোটে আবার ঝরে' যায়—মানুষ জন্মে আবার মরে' যায়—যেখানে গড়ে আবার ভাঙে—ভাঙে আবার গড়ে—যেখানে আশার অন্ত নেই, আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই, সাহসের সীমা নেই।"

"তোমরা মর্ত্ত্যের জীব?"

"আমরা মর্ত্ত্যের জীব।"

"কি চাও তোমরা?"

"তুমি কে ?"

"আমি গন্ধর্ব্ব।"

"শোনো গন্ধর্ব্ব—আমরা চাই পরস্পরের মিলন। এই পাঁচ বৎসর ধরে' আমরা এই নির্ঝরিণীর দু'তীর দিয়ে দু'জনে হেঁটে এসেছি—আর এই পাঁচ বৎসর ধরে' এই নির্ঝরিণী আমাদের মাঝ দিয়ে একটা অনন্ত বাধার মত বয়ে' গিয়েছে। জানি আজ আমাদের যাত্রার শেষ। কোথায় ? ওইখানে—যেখান থেকে জলপ্রপাত পড়্ছে—ঐখানে নির্ঝরিণীর শেষ, ঐখানে বাধার শেষ, ঐখানে আমাদের মিলন হবে।"

"অসম্ভব।"

"কি অসম্ভব গন্ধর্ব্ব ?"

"তোমাদের মিলন।"

"কেন অসম্ভব গন্ধর্ব্ব ?"

"কেন অসম্ভব তা বল্‌তে পারিনে। তবে বোধ হয় মিলন হ'লে সকল পাওয়ার, সকল চাওয়ার শেষ—তাই বুঝি অসম্ভব। শোনো মানব, এ চেষ্টা ছাড়—তোমরা ফিরে যাও।"

মানব উন্নত-শিরে বজ্রকণ্ঠে বল্‌ল—"কখনও না।"

মানবী নত-নয়নে মৃদুস্বরে প্রতিধ্বনি কর্‌লে—"কখনও না।"

কল্পশেখর জিজ্ঞেস কর্‌ল—"এ পাহাড়ে ওঠ্‌বার কি কোন উপায় নেই—কোন রাস্তা নেই গন্ধর্ব্ব ?"

"তোমরা ফিরে যাও।"

"এ পর্ব্বতে আরোহণ করা কি অসম্ভব গন্ধর্ব্ব ?"

"শোনো—তোমরা ফিরে যাও।"

"একি মানুষের অসাধ্য গন্ধর্ব্ব ?"

"অসাধ্য নয়—দুঃসাধ্য।"

"তবে সাধ্য।"

"আপনার অদৃষ্টকে বশ করতে চাও ?"

"চাই।"

"নিতান্তই ফিরবে না ?"

"শোনো গন্ধর্ব্ব—ফিরব কোথায় ? ফেরা মানে মৃত্যু। আজন্ম যে স্বপ্ন অন্তরে সুপ্ত হয়েছিল—কৈশোরে যে স্বপ্ন অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষার নিরুদ্দেশ সন্ধানে ঘরছাড়া করেছিল—যৌবনে গত পাঁচ বৎসর ধরে' যে আকাঙ্ক্ষার মাদকতা এ দেহের অণু-পরমাণুতে পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হয়েছে—সেই স্বপ্ন সেই আকাঙ্ক্ষাকে ছাড়তে বল, গন্ধর্ব্ব ! মানুষের মন তুমি জান না !"

"বেশ তবে শোন। এ পাহাড়ে ওঠ্‌বার রাস্তা আছে কিন্তু সেখানে যাবার জন্যে চাই অসীম ধৈর্য্য। তোমাদের তা আছে ?"

"মানুষের ধৈর্য্যের সীমা নেই।"

গন্ধর্ব্ব বলতে লাগল—"এই যে পাহাড় এ প্রাচীরের মতো, যোজন দীর্ঘ—একেবারে প্রাচীরের মতো খাড়া। কিন্তু এই পর্ব্বত-প্রাচীর যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে দুই প্রান্ত শুধু উপর থেকে ঢালু হ'য়ে নেমেছে। সেই ঢালু জায়গা দিয়ে এর উপরে ওঠ্‌বার পথ ! এখন তোমাদের দু'জনকে নির্ঝরিণীর দু'তীর থেকে পর্ব্বতের দু'প্রান্তে পৌঁছিতে হবে। সেখানে পৌঁছে পাহাড়ে ওঠ্‌বার রাস্তা

দেখ্‌বে। দু'ধার থেকে দু'রাস্তা বরাবর চলে' পাহাড়ের উপরের একটা হ্রদের তীরে প্রকাণ্ড একটা শাল্মলী তরুর মূলে এসে মিলেছে। সেই হ্রদ থেকেই এই ঝরণার উৎপত্তি। ওই রাস্তায় যদি তোমরা পথ হারিয়ে না ফেল তবে সেই হ্রদের তীরে তোমাদের মিলন হ'তে পারে।"

কল্পশেখর জিজ্ঞেস করল -"এ যাত্রা শেষ হবে কত দিনে?"

গন্ধর্ব্ব উত্তর দিলে—"কত দিনে তা কে জানে—কে বল্‌বে সে কথা?"

গন্ধর্ব্ব অন্তর্ধান হ'ল।

কল্পশেখর তরুণীর দিকে ফিরে বল্‌ল -"তরুণী সাহস আছে?" তরুণী উত্তর দিলে—"আছে।"

"লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হবে না?"

"না।"

দু'জনে দু'দিকে যাত্রা করল। কত দিনের জন্য কে বল্‌বে?

* * * * *

সে দিন সূর্য্য ডুবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কল্পশেখর বাতাসের গায় তাজা পদ্ম ও ভিজে শেওলার গন্ধ পেলে। কল্পশেখর বুঝ্‌ল যে গন্ধর্ব্ব যে হ্রদের কথা বলেছিল সে হ্রদ আর বেশি দূরে নয়—তার যাত্রা শেষ হবার আর বেশি বিলম্ব নেই। কল্পশেখর দ্রুতপদে চল্‌তে লাগ্‌ল। যখন চারিদিক আঁধার হয়ে এল তখন সে হ্রদের তীরে এসে পৌঁছিল। চারিদিকে চেয়ে সে হ্রদের উত্তর তীরে একটা প্রকাণ্ড গাছ দেখ্‌তে পেলে। বুঝ্‌লে এই সেই শাল্মলী তরু।

কল্পশেখর হ্রদের তীর দিয়ে গিয়ে সেই শাল্মলী তরুর মূলে পৌঁছিল। তারপর তারি নীচে বসে' পড়্‌ল।

চারিদিক তখন নিবিড় কালো আঁধারে ঢেকে গেছে—গভীর নিস্তব্ধতায় ভরে' উঠেছে। আলকাৎরার চাইতেও কালো সে আঁধার, মৃত্যুর চাইতেও গভীর সে নিস্তব্ধতা। এমনি আঁধারের মাঝে, এমনি নিস্তব্ধতার মাঝে কল্পশেখর বসে' বসে' হাজার চিন্তার জালে তার মনটাকে জড়াতে লাগ্‌ল।

কল্পশেখরের ত আজ যাত্রা শেষ। কিন্তু তরুণী!—কোথায় সে? সে কি এই কঠিন বন্ধুর পথ অতিক্রম করে আস্‌তে পারবে এই তার গম্য-স্থানে— এই তার কাম্য স্থানে? পথে কত বিপদ কত আপদ অতিক্রম করে' না কল্পশেখর আজ এই হ্রদের তীরে কত বন পারে পৌঁছেচে—ওঃ কত বন সে যেন সৃষ্টির আগে হতে—সারাজীবন যেন সে পথই চলেছে—এই সাহস এই ধৈর্য্য কি তরুণীর হবে?—ওঃ—তরুণি—তরুণি!

সহসা সেই গভীর নিস্তব্ধতা বিভিন্ন করে' কার পায়ের শব্দ কল্পশেখরের কানে এসে বাজ্‌ল। কল্পশেখর উৎকর্ণ হয়ে সেই দিকে চেয়ে দেখ্‌ল। নিবিড় আঁধারে কিছুই দেখা যায় না—কিন্তু স্পষ্ট পদশব্দ স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হ'তে লাগ্‌ল। ধীরে ধীরে কল্পশেখরের দৃষ্টি আঁধার ভেদ করতে সমর্থ হ'ল। সে দেখ্‌লে একটা মানুষের মূর্ত্তিই বটে—তারই পানে আস্‌ছে।

কল্পশেখরের শিরায় শিরায় শোণিত দুরন্ত নৃত্য লাগিয়ে দিল—তার হৃদয়ে যেন অসংখ্য বিদ্যুত-প্রবাহ পরস্পর মারামারি কাটাকাটি

করতে লাগ্‌ল। কল্পশেখর উঠে সেই মূর্ত্তিটির পানে অগ্রসর হ'ল। যখন তারা পরস্পর কাছাকাছি হ'ল তখন কল্পশেখর যেন অপরিচিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল—"তুমি কে ?"

"আমি তরুণী।"

মুহূর্ত্তে চারটি বাহু দুইটি দেহকে জড়িয়ে নিল—তাদের আজীবন ব্যর্থ প্রাণের অনন্ত পিপাসা নিয়ে, চারটি অধর একটা নিবিড় চুম্বনে যুক্ত হ'ল—তাদের আজীবন পরিপুষ্ট হৃদয়ের অদম্য কামনা নিয়ে। তারপর আজীবন সাধনার সিদ্ধিলাভের শেষে জীবনব্যাপী ক্লান্তি যেন তাদের দুটি শরীরের ওপারে একেবারে ভেঙে পড়্‌ল—তারা সেইখানে বসে' পড়্‌ল—তারপর ধীরে ধীরে পরস্পরের আলিঙ্গনাবদ্ধ হ'য়ে সেই পাষাণ শয্যায় ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হ'য়ে পড়ল। পাষাণ-শয্যা ?—না, সে-শয্যা পুষ্পের চাইতেও কোমল।

পরদিন প্রথম উষার সঙ্গে সঙ্গে কল্পশেখরের ঘুম ভাঙ্‌ল। ধীরে ধীরে তার সব কথা মনে পড়্‌ল। সফল তার জীবন। আজীবন-সাধনার ধন আজ তার আলিঙ্গনে। কল্পশেখর আলিঙ্গন-বদ্ধার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌ল—একি !!!

উদ্যতফণা ফণিনীকে সাম্‌নে দেখ্‌লে পথিক যেমন লাফিয়ে উঠে দশ হাত পিছিয়ে যায়, তেমনি চক্ষের পলকে কল্পশেখর তাকে আপনার আলিঙ্গন-মুক্ত করে' লাফিয়ে উঠে সেই পাষাণ শয্যার কাছ থেকে পিছিয়ে গেল। তারপর বজ্রাহতের মতো শূন্যদৃষ্টিতে তারি সারানিশার আলিঙ্গনবদ্ধা নিদ্রাভিভূতার দিকে তাকিয়ে রইল।

নিদ্রাভিভূতা আলিঙ্গনচ্যুতা হ'য়ে ধীরে ধীরে চোখ মেল্‌ল।

পাষাণ শয্যা ত্যাগ করে উঠে বস্‌ল। তারপর কল্পশেখরের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌ল।

কল্পশেখর কর্কশকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল—"কে তুমি?"

"আমি তরুণী।"

কল্পশেখর পাগলের মতো হেসে উঠ্‌ল। সে হাসি আশে পাশে পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিহত হ'য়ে কোন্ এক প্রেতলোকের বিকট বীভৎস শব্দের মতো প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠ্‌ল। চীৎকার করে' নিশির সঙ্গিনীর মুখমণ্ডলের দিকে দেখিয়ে দিয়ে ঘৃণার স্বরে বলে উঠ্‌ল—"তুমি—তুমি তরুণী—ওই লোল চর্ম্ম, বিরল দন্ত, মুখের উপরে শুক্‌নো চামড়ার মতো দুখানা ঠোট—দীপ্তিহীন কোটরগত ঐ দুটি চোখ—মাথায় কাশফুলের মতো সাদা একরাশ চুল—তুমি—তুমি—তরুণী!"

জরাগ্রস্ত রমণী করুণ বিষাদের হাসি হেসে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল তারপর কল্পশেখরের কাছে এসে তার হাতখানি ধরে' তাকে হ্রদের তীরে জলের কিনারে নিয়ে গেল। তারপর আপনার কৃশ হস্তের শুষ্ক অঙ্গুলি বিস্তার করে জলের দিকে দেখিয়ে দিয়ে বল্‌লে "দেখ।" কল্পশেখর দেখ্‌ল।

কল্পশেখর দেখ্‌ল হ্রদের জলে আপনার প্রতিবিম্ব। পেশীহীন গণ্ডদ্বয়ে রসহীন চামড়া ঝুল্‌ছে—সাদা ভূরুর নীচে কোটরগত দুটি চক্ষু কুয়াসায় ঢেকে গেছে—মসৃণ ললাটে করাল কাল তার নিষ্ঠুর দাঁত বসিয়েছে—আর মাথার ওপরে বরফের চাইতেও সাদা একরাশ

চুল গুচ্ছে গুচ্ছে তার অস্থি-চর্ম্ম-সম্বল কাঁধের ওপরে এসে পড়েছে। তরুণীর ধ্যানে এতদিন তার তা চোখেই পড়েনি। কল্পশেখর দুই হাতে মুখ চোখ ঢেকে সেইখানে বসে পড়ল।

মানুষের দেহ তার মনকে ব্যর্থ করেছে।

একটা আষাঢ়ে গল্প।

কিসে যে কি হ'ল, আঠার বছর বয়সের রাজপুত্র চাঁদের মত মুখ, আকাশের মত চোখ, তারার মত দৃষ্টি, পদ্মের মত হাত, কবাটের মত বুক, একদিন মাকে এসে বললে—"মা, আমি রাজ্যও করব না, সংসারও করব না!"

প্রৌঢ় রাজমহিষী সামনে একখানা আরশি ধরে সিঁথিতে মোটা করে একটা সিঁদূরের রেখা টানতে যাচ্ছিলেন, রাজপুত্রের কথা শুনে তাঁর হাত কেঁপে উঠল, সিঁদূরের রেখাটা বেঁকে গেল। জিজ্ঞেস করলেন—"রাজ্যও করবি নে, সংসারও করবি নে তবে কি করবি?"

রাজপুত্র উত্তর দিলেন—"একদিক বলে' বেরিয়ে যাব মা!"

মা জিজ্ঞেস করলেন—"সে দিকটা কোন্ দিক?"

ছেলে উত্তর দিলেন—"সে-দিকটা কোনো একটা দিক নয় মা, সে-দিকটা সকল দিক।"

রাজরাণী অনুনয়ের স্বরে বললেন—"এ কি পাগলামি বাবা রাজ্যও করবি নে, সংসারও করবি নে, এ রাজ্য দেখবে কে? প্রজা-পালন করবে কে?"

রাজপুত্র উত্তর করলেন—"কে করবে জানি নে মা, শুধু এই জানি যে, আমি এখানে হাঁপিয়ে উঠেছি। এই সাতমহলা পুরী, দ্বারে দ্বারে দ্বারী, উঠতে বসতে কায়দা-কানুন, খেতে-শুতে দণ্ড প্রহর গণা, দু'পা যেতে সঙ্গে সাত শ' লোকের হৈ হৈ রৈ রৈ, একবার মুখ

খুললে দশবার "যুবরাজের জয় হোক" শোনা! জীবনের প্রবাহ থেকে সব রস শুকিয়ে ফেলে যেন শক্ত পাথর দিয়ে ভরে' দিয়েছে। এ থেকে আমি একবার ছুটা চাই, কেবল ছুটতে, খোলা আকাশের তলে মুক্ত বাতাসের মাঝে, সামনে পিছনে ডানে বাঁয়ে কোন শৃঙ্খল নেই, কেবল ছুটতে, বন্ধনহীন শৃঙ্খলহীন কেবল ছুটতে, আর ছুটতে আর ছুটতে; ব্রহ্মাণ্ডের আকাশটাকে চোখ ভরে' দেখে নিতে, দিগন্তের বাতাসটাকে বুক পুরে টেনে নিতে; একবার, একবার আমি ছুটা চাই।"

রাজরাণী মনে করলেন রাজপুত্র পাগলই হ'ল না কি। তৎক্ষণাৎ রাজার কাছে খবর পাঠালেন।

রাজা এলেন! বৃদ্ধ রাজা, মাথার চুল সাদা, ভুরু সাদা, চোখের পাতা পর্য্যন্ত পেকে গেছে। যুবরাজ পিতৃচরণ বন্দনা করলেন। তারপর বললেন—"মহারাজ আপনার দাসানুদাস একবার মুক্তি চায়।" রাজরাজেশ্বর পরাজয় মানল, বৃদ্ধ পিতা তার সন্তানের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন—"এখানে কিসের অভাব বাবা, যে বনবাসী হবে, কোন্ দুঃখে এ সংসার ছেড়ে যাবে?"

যুবরাজ উত্তর করলেন—"মহারাজ! এখানে সব চাইতে বড় অভাব যে কোনো অভাব নেই। মহারাজ, আমি ঠিক জানিনে কোন্ দুঃখ বড়—অভাবের, না অভাবহীনতার। যেখানে মনে ইচ্ছার উদয় হতে না হতেই তা প্রতিপালিত হচ্ছে সেখানে মানুষ থাকে কি করে', কোন্ অবলম্বনকে ধরে' মানুষ সেখানে বাঁচবে? তার চাইতে মহারাজ আমার মনে হয় পথের মুটেটা পর্য্যন্ত সুখী, তার সামর্থের চাইতে

যে তার আকাঙ্ক্ষা বড়, তাই তার বাঁচবার মধ্যে একটা চিরন্তনের কৌতুক, চিরন্তনের রহস্য আছে যা কোনদিনই নষ্ট হয় না। মানুষের জীবনে একটা চিরন্তনের চেষ্টার দিক আছে বলেই সে-জীবনকে মানুষ সত্য করে পায়। যে জীবনে এই চেষ্টার দিকের আয়োজন নেই, আকাঙ্ক্ষা করবার কিছু নেই, সে জীবন মৃত্যুরই সামিল। সে জীবন স্বাস্থ্যবান দেহ-মন-প্রাণের পক্ষে বিষ। মহারাজ, এই মৃত্যু থেকে, এই বিষের সংস্পর্শ থেকে আমি ছুটী চাই। অন্ততঃ আমার দেহটাকে একবার ছুটিয়ে দিয়ে দেখতে চাই—মহারাজ অনুমতি দিন।"

বৃদ্ধ রাজা একবার মুহূর্ত্তের জন্যে অতিপ্রয়াস করে মেরুদণ্ডটাকে ঋজু করে দাঁড়ালেন, দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন—"যুবরাজ! আমার অবসর গ্রহণের কাল উপস্থিত, রাজ্যের ভার তোমার, সেই রাজ্যের অবহেলা করে' কর্ত্তব্যের অবমাননা করবে? শাস্ত্রবিরোধী ধর্ম্ম আচরণ করবে?"

যুবরাজ উত্তর করলেন—"রাজরাজেশ্বর! রাজধর্ম্মের চাইতে মানুষের ধর্ম্ম বড়, মানুষের ধর্ম্ম যেখানে রাজার ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করেই সফল হ'তে চায় সেখানে তাই-ই তার সত্য, তাই-ই তার শাস্ত্র। মানুষ রাজসিংহাসনে বসে গৌরব অনুভব করুক কিন্তু মানুষ রাজার চাইতে চিরকালের বড়। মহারাজ, আপনার পুত্রদের মধ্যে যারা রাজসিংহাসন আকাঙ্ক্ষা করে তারা রাজ্যশাসন করুক প্রজাপালন করুক, আমাকে এই বর্ণহীন বৈচিত্র্যহীন অভ্যাসের জঠর-চক্র থেকে মুক্তি দিন। আমি ঘুরতে চাই; কিন্তু তা চক্রে নয়—দিগন্তের পানে, আর নিজের ইচ্ছায়।"

কিছুতেই কিছু হ'ল না। পাটরাণীর চোখের জল, বৃদ্ধ রাজার কাতর বচন, বুড়ো মন্ত্রীর অনুনয় বিনয় অনুরোধ উপরোধ কত বুঝোনো কত পড়ানো কিছুতেই কিছু হ'ল না। রাজপুত্রের কেবল এক কথা—মুক্তি চাই, মুক্তি চাই, মুক্তি চাই।

মন্দ সংবাদ বাতাসের আগে ধায়। সূর্য্যদেব আকাশের এক পোয়া-পথ যেতে না যেতে সারা রাজধানীতে দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়ল, —যুবরাজ যে মনের দুঃখে রাজ্য ছেড়ে চলে' যাবেন!

দেখতে দেখতে সেই আনন্দ-কোলাহলময়ী রাজধানী থমকে-থাকা অশ্রুভরা আঁখির মত ভার হয়ে উঠল, বিষণ্ণ হয়ে উঠল। যুবরাজ—যাঁর চাঁদের মত মুখ, আকাশের মত চোখ, তারার মত দৃষ্টি, পদ্মের মত হাত, কবাটের মত বুক, সেই যুবরাজ মনের দুঃখে কিনা বনবাসী হবেন! দোকানী দোকান পাট বন্ধ করল, ব্যবসায়ী তার আড়ত বন্ধ করল, ভিক্ষুক তার ভিক্ষা বন্ধ করল, নাগরিকেরা তাদের গৃহ হতে তাদের কর্ম্মস্থান হ'তে দলে দলে বেরিয়ে পড়ল। দলে দলে লোক রাজপ্রাসাদের দিকে ছুটতে লাগল। ধনী দরিদ্র উচ্চ-নীচ স্ত্রী-পুরুষ যুবক-যুবতী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ব্রাহ্মণ-বৈশ্য রাজপুরীর সামনে ক্রমে ক্রমে কোটী লোক জমা হ'ল। সকলেরই এক প্রতিজ্ঞা—আমরা যুবরাজকে যেতে দেব না। কোন্ দুঃখে কিসের অভাবে যুবরাজ এমন সোণার রাজ্য ছেড়ে বনবাসী হবেন? আমাদের যুবরাজ—যাঁর চাঁদের মত মুখ, আকাশের মত চোখ, তারার মত দৃষ্টি, পদ্মের মত হাত, কবাটের মত বুক, তাঁর দুঃখ কিসের? কি অভাব? আমাদের জানান সে অভাব, প্রাণ দিয়ে আমরা সে অভাব

পূরণ করব, না পারি তাতে জীবন দেব; কিন্তু যুবরাজকে ছাড়ব না।

রাজপ্রাসাদের সামনে লোক গিস্ গিস্ করতে লাগল। কেবল মাথা আর মাথা আর মাথা—একটা মাথার বিরাট অরণ্য। সেই বিশাল জনারণ্য থেকে বিরাট গম্ভীর জলধি-কল্লোলের মত কোটী কণ্ঠে এক সঙ্গে ধ্বনিত হ'য়ে উঠল—"জয় যুবরাজের জয়", "অঙ্গ-বঙ্গ-মগধ-মিথিলা-কাশী-কাঞ্চীর যুবরাজ জয় তরুণাদিত্যের জয়।"

সেই কোটী কণ্ঠের বজ্র-নির্ঘোষনাদে সাতমহলা রাজপুরীর সাত-মহল কেঁপে উঠল, মহলে মহলে সব খাট পালঙ্ক আচম্‌কা নড়ে উঠল, সাত মহলে শত রাণীর পোষাপাখীর দল তাদের খাঁচার ভিতরে ভীষণ চাঞ্চল্যের সঙ্গে এধার ওধার করে' অর্থহীনভাবে উড়ে বেড়াতে লাগল, টিয়ে পাখীরা দাঁড়ে বসে' ভীষণ ব্যস্ততা সহকারে তাদের পায়ের শিকল কাটবার বৃথা চেষ্টা করতে লাগল, ময়ূরের দল মেঘ ডাকছে মনে করে' তাদের পেখম খুলে দাঁড়াল।

বজ্র-নিনাদে কোটী কণ্ঠ থেকে আবার ধ্বনি উঠল—"জয় যুবরাজের জয়", 'অঙ্গ-বঙ্গ-মগধ-মিথিলা-কাশী-কাঞ্চীর যুবরাজ জয় তরুণাদিত্যের জয়।"

বৃদ্ধ মন্ত্রী বললেন, "যুবরাজ, পৌরজনের জনপদবাসীর এই স্নেহ এই অনুরক্তি অবহেলা করবার বিষয় নয়। সমস্ত সাম্রাজ্যের স্নেহ ভালবাসা উপেক্ষা করে' সংসারে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করে' একা একা থাকলে কোন্ উদ্দেশ্য সফল হবে যুবরাজ ?"

যুবরাজ উত্তর করলেন, "সংসারে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকতে কে চায়

মন্ত্রী ? কিন্তু অঙ্গ-বঙ্গ-মগধ-মিথিলা-কাশী-কাঞ্চীতে, এই বিশাল সাম্রাজ্যে সবার চাইতে বিচ্ছিন্ন কি, সবার চাইতে বিচ্ছিন্ন কে মন্ত্রী ? এই সাম্রাজ্যের রাজসিংহাসন, এই সাম্রাজ্যের রাজা—নয় কি ? এই বিরাট বিচ্ছিন্নতা যে আমাদের চোখে পড়ে না, তার কারণ সে শূন্য জায়গাটাকে যে আমরা অসংখ্য অসংখ্য আসবাব দিয়ে ভরে' দিয়েছি —এই বিচ্ছিন্নতা ঢাকবার জন্যেই এই বিচ্ছিন্নতাকে ভুলিয়ে দেবার জন্যেই সে-সব আসবাবের এত আড়ম্বর, রাজা যত বড় তাঁর প্রজা-মণ্ডলী থেকে তার পারিপার্শিক থেকে তাঁর বিচ্ছিন্নতাও তত সম্পূর্ণ আর তাঁর আসবাব পত্রের আড়ম্বরও তত বেশি। বহু শতাব্দী বহু পুরুষ এই আড়ম্বর এই জাঁকজমকে আমরা ভুলে ছিলেম। মন্ত্রী, আর সম্ভব নয়, আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়, আমি থাকতে চাই সংসারে সহজ হয়ে, সংসারের নিবিড়তম সংস্পর্শে। তাই আমি রাজসিংহাসনের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি চাই।"

মন্ত্রী বললেন, "যুবরাজ এই সাম্রাজ্যের সমস্ত প্রজামণ্ডলীর দাবী অগ্রাহ্য হবে ? উপেক্ষিত হবে ?"

রাজপুত্র উত্তর করলেন, "মন্ত্রী প্রজামণ্ডলীর দাবী রক্ষা করতে আমি তখনই পারব যখন আমার দাবীও সেই সঙ্গে সঙ্গে সফল হয়ে উঠবে ! আমার মিথ্যা দিয়ে প্রজামণ্ডলীকে সত্য উপহার কেমন করে' দেব ? তাতে যে সার্থক কেউ-ই হ'য়ে উঠবে না।"

কিছুতেই কিছু হোল না। প্রজামণ্ডলীর মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি, চতুর মন্ত্রীর যুক্তিতর্ক, বৃদ্ধ রাজার কাতর ভাব, কিছুতেই কিছু হোল না।

রাজপুত্রের কেবল এক কথা, আমি ছুটতে চাই, ছুটতে চাই, ছুটতে চাই, উদার আকাশের তলে অন্তহীন দিগন্তের পানে।

বিশাল সাত মহলা রাজপুরী—কত হাসি কত গান কত আমোদ কত উৎসব কত কলরব, সব এক বিরাট নৈরাশ্যের ছায়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। নহবতে নহবতে রসুনচৌকির সুর আর ফুটল না, ঘোড়াশালে লক্ষ ঘোড়া তাদের খাওয়া বন্ধ করল, হাতীশালে হাজার হাতীর চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে' জল পড়তে লাগল, ময়ূরের দল আর নাচল না, শারী শুকেরা ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে কাঁদতে বসল, হায়! যুবরাজ, যাঁর চাঁদের মত মুখ, আকাশের মত চোখ, তারার মত দৃষ্টি, পদ্মের মত হাত, কবাটের মত বুক, তিনি কি না এমন সোণারসংসার ছেড়ে চলে যাবেন! আনন্দের পুরী অশ্রুতে অশ্রুতে ভরে' উঠল।

কিছুতেই যখন কিছু হোল না তখন রাজা সর্ব্ববিঘ্ননাশন এক যজ্ঞ করতে আদেশ করলেন।

প্রকাণ্ড এক যজ্ঞমণ্ডপ উঠল। যজ্ঞমণ্ডপ আগাগোড়া শুভ্র বস্ত্রমণ্ডিত হ'য়ে সদ্য প্রস্ফুটিত শ্বেত পদ্মের মত শোভা পেতে লাগল। দেশ বিদেশ থেকে কত ব্রাহ্মণ কত পণ্ডিত এলেন, কাশী কাঞ্চী মগধ মিথিলা কোশল পাঞ্চাল, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম, কত কত দিক দেশ থেকে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সব এসে যজ্ঞমণ্ডপ জুড়ে' বসলেন। যজ্ঞমণ্ডপ একেবারে গম্ গম্ করতে লাগল। কত পুরোহিত ঋত্বিক! বৈদিক মন্ত্রের গম্ভীর ধ্বনিতে যজ্ঞমণ্ডপ গুম্ গুম্ করে' উঠল। হোমের আগুন লক্ লক্ জিহ্বা মেলে দিয়ে আকাশপানে দব্ দব্ করে' জ্বলে উঠল। অঞ্জলি অঞ্জলি আজ্যের

সঙ্গে স্বাহা স্বাহা ধ্বনিতে সমস্ত ঘর ধ্বনিত হয়ে উঠল। যজ্ঞ শেষ হয়ে গেল। রাজপুত্র যজ্ঞভস্মের ফোঁটা কপালে এঁকে লক্ষ ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ সঙ্গে নিয়ে প্রকাণ্ড এক সাদা ঘোড়ায় সোয়ার হলেন। রাজা এসে বললেন—"কুমার, আবার যেন ফিরে এসো।" রাণী এসে বললেন—"বাবা, আবার যেন ফিরো।" মন্ত্রী এসে বললেন—"যুবরাজ, আবার যেন ফিরে আসেন।" মন্ত্রীপুত্র কোটালের পুত্র এসে বললেন—"বন্ধু দেখো যেন চিরকাল ভুলে থেকো না—আবার ফিরে এসো।" রাজপুত্র হাসি মুখে সবাইকে বিদায় দিয়ে, সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সিংহদ্বার দিয়ে বেরিয়ে বায়ুবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

(২)

প্রকাণ্ড ঘোড়া—দুধের মত রঙ্, রাজহংসীর মত গ্রীবা, রেশমের মত গা, বায়ুবেগে ছুটে চলল। রোদ পড়ে' তার সাদা রেশমী গা চিক্ মিক্ করতে লাগল, খোলা আকাশের মুক্ত বাতাস তার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে' যেন তাকে উন্মত্ত করে' তুলল, ঘোড়া যেন পাখা লাগিয়ে বাতাসের আগে উড়ে চলল। রাজপুত্র ছুটে চললেন যেদিকে দু'চোখ যায়। এ রাজার মুল্লুক ছেড়ে ও-রাজার মুল্লুকে, ও-রাজার মুল্লুক ছেড়ে সে-রাজার মুল্লুকে, সে-রাজার মুল্লুক ছেড়ে আর রাজার মুল্লুকে, এমনি করে ছুটে চললেন। কত নদ নদী পর্ব্বত পল্লী নগর কত কানন প্রান্তর পার হয়ে রাজপুত্র ছুটে চললেন, ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই, আহার নেই, নিদ্রা নেই। যে রাজ্যের ভিতর দিয়ে যান সেখানেই পুরুষরা বলাবলি করে—"আঃ কে এমন ভাগ্যবান যে

এমন পুত্রের জন্ম দিয়েছে। কুলাঙ্গনারা বলে, "উঃ, কেমন নিষ্ঠুর মা যে এমন ছেলেকে ছেড়ে জীবনধারণ করছে।" রাজপুত্র কত রাজ্য ছাড়িয়ে গেলেন অঙ্গ বঙ্গ, মগধ মিথিলা, কোশল পাঞ্চাল, চোল চালুক্য, পল্লব পাণ্ড্য, অবন্তী দ্বারকা—কত কত রাজ্য। এর পর ছুটতে ছুটতে একেবারে পৃথিবীর শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছিলেন। আর চলবার উপায় নেই। সামনে ডা'নে বাঁয়ে কেবল জল আর জল আর জল, কেবল নীল আর নীল আর নীল। সেই নীল জলের বুকে সাদা ফেনার মুকুট মাথায় দিয়ে লক্ষ ঊর্ম্মিবালারা সব হেলছে দুলছে উঠছে পড়ছে হাসছে, নাচছে। নৃত্যেরও বিরাম নেই মুখরতারও ক্লান্তি নেই। এখাকে ছল্ ছল্ ছল্ ছল্ ছলাৎ, ওখানে চল্ চল্ চলাৎ; এমনি করে' সব লুটো-পুটি খাচ্ছে। পিছনের সমস্ত পৃথিবীর কল কোলাহল এখানে এসে থমকে গেছে, সমস্ত সংগ্রাম এখানে এসে লজ্জায় অবশ হ'য়ে গিয়েছে। এখানে কেবল একটা বিরাট নির্লিপ্ততা, সকল প্রকার সংকীর্ণতাকে যা মুক্তি দিয়েছে, সকল প্রকার বিরোধকে যা অসত্য করে' তুলেছে।

নোনাজলের গন্ধ পেয়ে রাজপুত্রের ঘোড়া আনন্দে চিঁহিঁহিঁ করে' উঠল। রাজপুত্র ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। তার পর লাগাম ঘোড়ার ঘাড়ের উপর ফেলে দিয়ে সমুদ্রের শুভ্র সৈকতে চিক্কণ বালির উপরে বসে পড়লেন। রাজপুত্রের দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'য়ে গেল সেইখানে যেখানে সমস্ত আকাশটা নীচু হ'য়ে নেমে এসে সমস্ত সাগরটাকে আপনার বুকে জড়িয়ে ধরেছে।

তখন সন্ধ্যা লেগে এসেছে। সমুদ্রের ঠাণ্ডা হাওয়া রাজপুত্রের

সারা শরীরে স্নিগ্ধ আদর ঢেলে দিতে লাগল। সে স্নিগ্ধ আদরের স্পর্শে রাজপুত্রের চোখ দুটো অম্‌নি বুঁজে বুঁজে আসতে লাগল। রাজপুত্র আর বসে' থাকতে পারলেন না, ধীরে ধীরে তন্দ্রামগ্ন হ'য়ে শুভ্র বালুশয্যায় ঢলে' পড়লেন।

সেই আধ-জাগা আধ-ঘুমের অবস্থায় রাজপুত্রের মনে হল' যেন হঠাৎ তার দু'কানের উপর থেকে দুটো পরদা খসে গেল। আর ঐ যে সমুদ্রের বিরামহীন মুখরতা, ও ত কেবল অর্থহীন কল্ কল্ ছল্ ছল্ ছলাৎ নয়। ঐ যে সমুদ্র আবহমান কাল ধরে' স্পষ্ট ভাষায় গান গাচ্ছে! আধ-ঘুমে রাজপুত্র শুনলেন সমুদ্র গাচ্ছে—

তুল্‌বি ওরে তুল্‌বি যদি আমার সুনীল দোলাতে
নাম্‌রে আসি' আমার বুকের জীবন-মরণ-খেলাতে।
দিগন্তে যে বইছে বায়
অনন্তে যে স্বপ্ন ছায়
অন্তিমেতে পারব আমি তোদের সে সব মিলাতে।

কূলের মায়া করিস্ কে রে? অকূলে কার নাইরে টান?
একটি বারে সাহস করি' শোন্‌রে আমার বুকের গান।
পলে পলে নিত্য করি'
হিয়ায় পুলক উঠ্‌বে ভরি'
ছুটবে তরী আকুল বায়ে লব্ধ করি' শ্রেষ্ঠ দান।

আমার বুকেই মুক্তি পেল ওই রে তোদের জাহ্নবী।
আমার বুকের নেয় নি স্নেহ কোন্ কবি সে কোন্ কবি?

আমার বুকেই চন্দ্র-তারা
সারা নিশীথ তন্দ্রাহারা
এই বুকেরই পাঁজরা থেকে ঊষায় জাগে হেম রবি।

এই বুকেতেই গুপ্ত ছিল সুর-অসুরের সুধা রে
এই বুকেতেই মুক্ত চির মর্ত্ত্য-মনের ক্ষুধা রে।
এই হিয়ার তলে তলে
শুক্তিবুকে মুক্তা জ্বলে
ঊর্ম্মিমালার সঙ্গে চলে মর্ত্ত্য-মনের সুধা রে।

এই বুকেরই' পরে আকাশ নামায় অসীম তার কায়া
মুক্ত ওরে কুণ্ঠাবিহীন হেথায় মাটীর সব মায়া।
বদ্ধ মাটীর ক্ষুদ্র প্রাণী
আমার বুকের নিশাস্ টানি'
দেখ্‌লে প্রাণে তার গোপনে লুকিয়ে অসীম কোন্ ছায়া!

রাজপুত্র ফিরে ফিরে যেন কেবলই শুনতে লাগলেন—

দুল্‌বি ওরে দুল্‌বি যদি আমার সুনীল দোলাতে

শুনতে শুনতে যেন সুনীল দোলায় দোল খেতে খেতে রাজপুত্র একেবারে সংজ্ঞাহীন হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

রাজপুত্রের যখন ঘুম ভাঙল তখন আকাশগায়ে অপ্সরীদের জ্যোছনার আল্‌পনা দেওয়া শেষ হ'য়ে গেছে। আধার কেটে চারিদিক একটা অস্পষ্টতার মাধুর্য্যে ভ'রে গিয়েছে। রাজপুত্র এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলেন—হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল তাঁর ডান দিকে

কিছু দূরে একেবারে সমুদ্রের বুক থেকে একটা ছোট্ট কালো পাহাড় উঠেছে আর সেই কালো পাহাড়ের উপরে একটা কি সাদা ধব্ ধব্ করছে। রাজপুত্র উঠে সেই দিকে যাত্রা করলেন।

রাজপুত্র পাহাড়ে উঠে দেখলেন এক প্রকাণ্ড রাজপুরী শঙ্খে গড়া। শঙ্খের দরজা শঙ্খের জান্‌লা শঙ্খের ঘর শঙ্খের দেয়াল শঙ্খের সিঁড়ি, আগাগোড়া শঙ্খে গড়া। কিন্তু জনপ্রাণী শূন্য। শঙ্খের প্রকাণ্ড সিংহদরজা খোলা, শান্ত্রী নেই প্রহরী নেই, নবৎখানায় রসুন-চৌকি নেই। রাজপুত্র সিংহদ্বার দিয়ে প্রবেশ করে' অশ্বশালে গেলেন। দেখলেন অশ্বশালে অশ্ব নেই, অশ্বপাল নেই, সব শূন্য। সেইখানে আপন ঘোড়া বেঁধে দানা-জল দিয়ে রাজপুত্র রাজপ্রাসাদে গিয়ে প্রবেশ করলেন।

রাজপ্রাসাদে জনপ্রাণী বলতে কেউ নেই। চারিদিকে থম্ থম্ করছে। শঙ্খে-গড়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড থামে জ্যোছনা পড়ে চক্ চক্ করছে, খোলা জান্‌লা দিয়ে জ্যোছনা এসে শঙ্খে-গড়া মেঝেতে পড়ে' তা ধব্ ধব্ করছে। মহলে মহলে জ্যোছনার আলো আর ঘরের ছায়া জড়িয়ে চারদিক যেন আরও নিবিড় আরও গভীর হয়ে উঠেছে। রাজপুত্র এ ঘর থেকে সে-ঘর, এ-কক্ষ থেকে সে-কক্ষ, এ-মহল থেকে সে-মহল করে' ফিরলেন। কোথাও একটু মানুষের ভাঁজ নেই। যেন সাগর-পারের কোন্ মায়াবিনী সাগর বুকের কোটি শঙ্খ কুড়িয়ে অমনি অমনি এক রাজপুরী তৈরী করে' রেখেছে।

শাদা ধব্ ধবে শঙ্খের সিঁড়ি। তাই বেয়ে রাজপুত্র দ্বিতলে উঠলেন। কক্ষে কক্ষে কত আসবাব-পত্র। শয়ন কক্ষে শঙ্খের

পালঙ্ক পাতা, ভোজন কক্ষে শঙ্খের গালিচা বিছানো, স্নানের ঘরে সব আড়-দেওয়া শঙ্খের চৌবাচ্চা, কেবল জনপ্রাণী বলতে কেউ নেই। আর সার সার শঙ্খের পিজরে ঝুলছে সব শূন্য, একটায়ও পাখী নেই। সার দেওয়া টিয়েপাখীর দাঁড় ঝুলছে, সব শূন্য একটা টিয়ে নেই। এমনি সুন্দর সে রাজপুরী আর এমনি নিস্তব্ধ, যেন তা এক পরমা সুন্দরী রাজকন্যা কিন্তু রূপোর কাঠি ছোঁয়ান। কোথায় সে সোণার কাঠি যে কাঠিতে রাজকন্যা জাগবে। কোন্ সে রাজপুত্র যে সোণার কাঠি খুঁজে আনবে! রাজপুত্র এ-ঘর ও-ঘর আর কত করবেন, তাঁর দু'পা ধরে' গেল। ক্লান্ত দেহে তখন তিনি গিয়ে একটা পালঙ্কে বসে' পড়লেন। অমনি যেন পালঙ্ক ধীরে ধীরে দুলতে লাগল রাজপুত্রের চোখ বুঁজে বুঁজে আসতে লাগল। চারিদিকে গম্ভীর নিস্তব্ধতা, আর মধ্যে রাজপুত্র যেন কেবল শুনতে লাগলেন—

দুল্‌বি ওরে দুল্‌বি যদি আমার সুনীল দোলাতে—

শুনতে শুনতে পালঙ্কের উপরে রাজপুত্র একেবারে বেঘোরে ঘুমিয়ে পড়লেন।

(৩)

তার পরদিন রাজপুত্রের যখন ঘুম ভাঙল তখন সূর্য্যদেব সমুদ্রের নীল বুক থেকে একটুকু কেবল মাথা তুলেছেন, ঘুমের জড়িমা তখনও তাঁর চোখ থেকে যায় নি, লম্পট সেই ঢুলু ঢুলু নেত্রেই ঊর্ম্মিমালাদের গায়ে গায়ে সোণালি সোহাগ ঢেলে দিয়েছেন! দু' একটা অশান্ত রশ্মি তাঁর চোখ থেকে ছুট দিয়ে একেবারে রাজপ্রাসাদের উঁচু চূড়াতে

গিয়ে চড়ে বসেছে। রাজপুত্র চোখ মেলেই দেখেন তাঁর পালঙ্কের পাশে দাঁড়িয়ে এক পরমা সুন্দরী বালিকা।

পরমা সুন্দরী! জ্যোস্নাবরণ তার রঙ, সোনার বরণ তার চুল, আকাশবরণ তার চোখ। সে রঙে চারিদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, সে চুল একেবারে হাঁটুতে এসে পড়েছে, সে চোখে আকাশের বুকের মত প্রশান্ত আর সাগরের বুকের মত গভীর দৃষ্টি, রক্ত কমলের মত দু'খানি হাত, পা দেখা যায় না, কটিদেশ থেকে সাগরবরণ একটা ঘাঘ্‌রা নেমে পা দুটি ঢেকে একেবারে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে, সারা দেহে আর দ্বিতীয় বস্ত্র নেই, সব অনাবৃত। দুটি হাতে দুখানি মুক্তা বসান শঙ্খের কাঁকন - আর দ্বিতীয় অলঙ্কার নেই।

রাজপুত্র বিস্মিত হয়ে পালঙ্কের উপরে উঠে বসলেন, প্রশংসার আলোকে তাঁর দুটি চোখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। রাজপুত্র বালিকার দিকে কতক্ষণ চেয়েই রইলেন, মনে মনে বললেন, এমন ত কখনও দেখিনি। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, "বালা তুমি কে? তোমায় আমি ভালবাসব।"

অমনি নবৎখানায় রসুনচৌকি বেজে উঠল। রাজপুত্র আশ্চর্য্য হ'য়ে বললেন—"একি! রসুনচৌকি বাজে কোথা থেকে, কাল যে সব শূন্য ছিল!"

বালিকা বললে—"আজ যে আমি এসেছি!"

অমনি হাজার পাখীর সুমিষ্ট কাকলি জেগে উঠল। রাজকুমার বিস্মিত হ'য়ে বললেন—"একি! এত পাখী ডাকে কোথা থেকে, পিঁজরে যে সব শূন্য ছিল!"

বালিকা তেমনি উত্তর দিলে—"আমি যে আজ এসেছি!"

অমনি হাতীশালে হাজার হাতী বৃংহতিনাদ করে উঠল, ঘোড়া-শালে লক্ষ ঘোড়া চিঁহিঁহিঁ করে উঠল। রাজপুত্র চমৎকৃত হয়ে বললেন—"এত হাতী এত ঘোড়া এল কোথা থেকে, কাল ত কিছুই ছিল না?"

বালিকা আবার তেমনি উত্তর করলে—"রাজকুমার, আজ যে আমি এসেছি!"

রাজপুত্র ছুটে ঘর থেকে বেরুলেন। দেখলেন বারান্দায় সার সার পিঁজরেতে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী উড়ছে, নাচছে, গাচ্ছে, ডানা নাড়ছে, গা ঠোকরাচ্ছে। রাজপুত্র নীচে নামলেন। কোথায় সে নিস্তব্ধ পুরী। চারিদিকে লোকজনে একেবারে গম্ গম্ করছে। দাস দাসী শান্ত্রী প্রহরী দৌবারিক প্রতিহারী যেন মুহূর্ত্তে কোন্ সোনার কাঠির স্পর্শে সব জেগে উঠেছে। দরজায় দরজায় শান্ত্রীরা সসম্ভ্রমে অভিবাদন করে' রাজপুত্রের পথ ছেড়ে দিলে। রাজপুত্র হাতীশালে গিয়ে দেখেন হাজার হাতী হাজার মাহুত। ঘোড়াশালে গিয়ে দেখেন লক্ষ ঘোড়া লক্ষ সোয়ার। রাজপুত্র তেমনি ছুটে আবার উপরে উঠলেন। বালিকাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—"তুমি কে?"

বালিকা একটু মৃদু হাসলে। যেন রক্তকমলের ন্যায় দুটি পাঁপড়ির ফাঁকে এক সার ঘন বিন্যস্ত যূথীর কলি জেগে উঠল। বালিকা হেসে বললে—"আমার নাম প্রেম।"

"প্রেম?—বড় ত সুন্দর!" রাজপুত্র প্রেমের চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সে নীল চোখে কি এক গভীর দৃষ্টি, তার তলই

পাওয়া যায় না। সে-দৃষ্টিতে রাজপুত্র যেন একেবারে হারিয়ে গেলেন। বললেন—"প্রেম, আমি তোমায় ভালবাসি—আমাকে ভালবাসবে ?"

প্রেম উত্তর দিলে—"রাজকুমার, আমাকে যে ভালবাসে আমিও তাকে ভালবাসি।

রাজপুত্রের বুকের কাছটায় যেন কি একটা ফেটে গিয়ে তার ভিতরকার রঙীন স্রোত তাঁর সমস্ত শিরায় উপশিরায় চারিয়ে গেল, তারি নেশায় তাঁর দেহের প্রত্যেক অণু পরমাণু নেচে উঠল। ওরে মুর্খ, ওরে নির্ব্বোধ! ব্যর্থতা কোথায় ?—সাতমহলা পুরীতে নয়, দ্বারে দ্বারে দ্বারীতে নয়, খেতে শুতে দণ্ড প্রহর জানানোতে নয়, সাত শ' লোকের হৈ হৈ রৈ রৈ-তে নয়—আছে তা কেবল হৃদয়ের সুন্দরহীনতায়, আছে তা কেবল জীবনের জড়ত্বে। এই ত আজ সাতমহলা পুরী, দ্বারে দ্বারে দ্বারী, তবে এর দেয়াল এমন রঙীন হয়ে উঠল কেন ?—অন্তরের ঐ আগুন লেগে রে নির্ব্বোধ! শিরায় উপশিরায় ঐ নেশা লেগে। রাজপুত্র বললেন—"প্রেম, যদি তোমায় পেতেম তবে আমার নিজ রাজ্য ছেড়ে আসতেম না।"

প্রেম জিজ্ঞেস করল—"তোমার নিজ রাজ্য ? সে কোথায় রাজকুমার ?"

দু'জনে গিয়ে পালঙ্কে বসল। তারপর রাজপুত্র আপনার কাহিনী বলতে সুরু করলেন। কেমন করে' তাঁর সংসারে বিতৃষ্ণা জন্মিল, কেমন করে' পিতার ইচ্ছা, মন্ত্রীর অনুরোধ, মায়ের চখের জল, প্রজামণ্ডলীর অনুরাগ, সমস্ত উপেক্ষা করে' তিনি রাজ্য ছেড়ে

চলে' এলেন। তারপর কত রাজ্যের ভিতর দিয়ে দিন নেই রাত নেই নিদ্রা নেই, আহার নেই, ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই—তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে রাত দিন কেবল ভ্রমণ করেই বেড়ালেন। তারপর অবশেষে কেমন করে' এই শঙ্খের রাজপুরীতে এসে পৌঁছিলেন, রাজপুত্র অনর্গল কথা বলে' যেতে লাগলেন যে, সে কত গল্প, তাঁর মুখ দিয়ে যেন গল্পের স্রোত বেরিয়ে আসতে লাগল। কোন্ দিক দিয়ে দিন কেটে গেল। সূর্য্য সারা আকাশ দিয়ে গড়িয়ে গিয়ে পশ্চিম সমুদ্রে ঝুপ করে' ডুব দিলেন, পশ্চিম আকাশে সোনালি আবির উড়তে লাগল, নবৎখানায় পূরবী রাগিনি বেজে উঠল, ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে এল, রাজপুরীর লক্ষ কক্ষে লক্ষ দীপ জ্বলে উঠল। প্রেম পালঙ্ক থেকে চমকে নেমে দাঁড়াল, বলল—"রাজকুমার, আমার যাবার সময় হ'ল আজ তবে আসি।"

—"আজ তবে আসি? সে কি প্রেম! সে কি প্রেম!"—রাজপুত্র ব্যথিত আকুল কণ্ঠে বললেন—"তুমি এই যে বললে আমায় ভাল বাসবে, তবে আবার কোথায় যাবে?"

প্রেম বললে—"রাজকুমার, আমাকে এখন নিজ ঘরে ফিরতে হবে, কাল আবার আসব।"

রাজপুত্র আশ্চর্য্য হয়ে বললেন—"তোমার নিজ ঘর!—সে আবার কোথায়? আমি যে মনে করেছিলেম তুমি এই রাজপুরীরই রাজকন্যা, কাল কোথায় কোন্ মহলে লুকিয়ে ছিলে।"

প্রেম উত্তর করলে—"না রাজকুমার আমি রাজপুরীর রাজকন্যা

নই। আমার ঘর ঐ ওখানে—সাগরবুকে।" বালিকা আঙুল দিয়ে বাতায়নের ফাঁকে দেখিয়ে দিলে সমুদ্র।

রাজপুত্র অমনি ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের ধারের ছাদে গেলেন। ছাদের আলসেতে কনুই রেখে যতদূর দৃষ্টি চলে তাঁর সামনে ডানে বায়ে দেখতে লাগলেন। দেখলেন কেবল জল আর, জল, আর জল। রাজপুত্র ফিরে এসে প্রেমকে বললেন—"কই সাগর বুকে ত কোন ঘর বাড়ীর চিহ্ন নেই।"

প্রেম বললে "সাগরবুকের উপরে নেই তার নীচে আছে। কুমার, আমার ঘর সাগরবুকের যেখানে প্রায় অতল সেইখানে। যেখানে সাগরবুকের উর্ম্মিবালারা তাদের নৃত্যে নৃত্যে আকাশের আলোক আর বাতাস মিশিয়ে আমার ঘর তৈরি করে দিয়েছে, সেইখানে আমি থাকি"

রাজপুত্র বিস্ময়ে সংশয়ে কতক্ষণ চুপ করেই রইলেন। তারপর বললেন, "প্রেম, কাল আসবে ত?"

প্রেম উত্তর দিলে—"আসব বই কি রাজকুমার—নিশ্চয়ই আসব।"

—"আচ্ছা তবে এসো।"

বালিকা রাজপুরী ত্যাগ করে' চলে গেল।

রাজকুমার গিয়ে পালঙ্কে বসলেন। তাঁর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পুলক খেলে বেড়াতে লাগল। দু'-বছরের দেশ-বিদেশে ভ্রমণ তাঁর, আজ সে কত দূর। আর আজ এই রাজপুরী তাঁর ছেড়ে যাবার উপায়ই নেই। আজ তিনি শৃঙ্খলাবদ্ধ। কিন্তু সে শৃঙ্খল, সে কি

হালকা! কেবলই হালকা, না তার চাইতেও বেশি, সে কি তৃপ্তির কি শান্তির, সে কি সার্থক! এই শৃঙ্খলে আজ তাঁর এ কী মুক্তি! বাইরের দু' বছরের তাঁর স্বাধীনতার মুক্তি, কেবল শূন্যের বোঝায় সে কী ভারাক্রান্ত! কী অশান্ত! আর আজ এই শৃঙ্খলে মুক্তি ঐশ্বর্য্যে সে কী সম্পদময়, কী শান্তিপূর্ণ!

রাজপুত্র স্বপ্নে কেবল বালিকাকেই দেখতে লাগলেন, তার আকাশ-বরণ চোখ—সে চোখের সাগর-গভীর দৃষ্টি।

(৪).

দু' বছর কেটে গেল। রোজ সূর্য্য-ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রেম তার জোছনা-বরণ রঙ, সোনার-বরণ চুল, আকাশ-বরণ চোখ, সাগর-বরণ ঘাঘরা নিয়ে রাজপুরীতে উপস্থিত হয়। রাজপুত্রের সঙ্গে গল্পে-গানে সারা দিন কাটিয়ে আবার সূর্য্য-ডোবার সঙ্গে সঙ্গে চলে' যায়। দুটি বছরের প্রত্যেক দিনটি ঠিক একই ভাবে কেটে গেল। সেই একই রাজপুরী, মহলে মহলে একই দাসদাসী, তাদের একই আনাগোনা, দেউড়ীতে দেউড়ীতে একই শান্ত্রী প্রহরী, এদের একই সোর-গোল, নহবতে নহবতে একই রসুনচৌকি, তার ভোর-দুপুর সন্ধ্যায় একই সুর, সেই সবই এক, কেবল এক যা' রইল না সে হচ্ছে রাজপুত্র নিজে।

সেই সাতমহলা পুরীতে রাজপুত্র আর এক রইলেন না! দু'বছর আগে যখন তাঁর প্রেমের সঙ্গে দেখা হয় তখন কি তৃপ্তিতেই তাঁর অন্তরাত্মা ভরে' গিয়েছিল, কি আনন্দের আলোকেই তাঁর চোখ দু'টি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল, কি শান্তিতেই তাঁর অস্তিত্ব জুড়িয়ে গিয়েছিল।

আর আজ, আজ তাঁর অন্তরাত্মার এ কি আসোয়াস্তি, তাঁর চোখ দু'টিতে কি এক জ্বালা, কি এক বিরাট রাক্ষসী ক্ষুধার অবলেপ, এ কি নিবিড় ব্যথা! রাজপুত্রের চোখ দুটি তার সমস্ত জ্বালা নিয়ে প্রেমের মুখ থেকে ধীরে ধীরে নেমে তার বুকে গিয়ে নিবদ্ধ হ'ল। আঃ, ঐ যে ঐ বুকের উপরে ঠিক তাঁরই হাতের মাপে মাপে দুটি পদ্মের কলি কে জাগিয়ে তুলছে। ঐ যে' সেই পদ্মকোরক দু'টির শীর্ষদেশটায় লালচে আভা, তা বুঝি তাঁরই হৃদয় শোণিতের অবলেপ।

ছিলে গো ছিলে, প্রেম! তুমি একদিন অতি সুকুমার ছিলে, আমি একদিন অতি কিশোর ছিলেম, সেদিন আমাদের মিলন ছিল একটু হাসির মিলন, একটি দৃষ্টি বিনিময়ের মিলন। আজ এ প্রদীপ্ত যৌবনে সে অল্পে সুখ কোথায়, তৃপ্তি কোথায়, আনন্দ কোথায়? এ যৌবনের উন্মত্ততাকে কি দিয়ে শান্ত করবে প্রেম? একটি দৃষ্টি দিয়ে? দু'টো কথা দিয়ে? একটুকু হাসি দিয়ে?—সে স্বল্পতাকে জীবন যে কখন্ ছাড়িয়ে গেছে!

না, না প্রেম! আজ আমি চাই তোমার নিবিড়তম আলিঙ্গন। তোমার কথা, তোমার গান, সে যে আজ কত ব্যবধানের। আজ চাই তোমার ঐ দেহ-বল্লরী আমার এই বিশাল বুকের উপরে পিষ্ট হ'য়ে যাবে, তোমার হাসি তোমার দৃষ্টি, সে-যে আজ কত স্বল্পতার! বুকে বুকে মুখে মুখে চোখে চোখে দেহের প্রত্যেক অণুতে অণুতে আজ মিলন, আজ বিনিময়—তবেই আজ তৃপ্তি, তবেই আজ আমার এ আত্মার বিদ্রোহের শান্তি। আমার এ রাক্ষসী ক্ষুধার কাছ থেকে

কি দিয়ে আত্মরক্ষা করবে প্রেম ? কি দিয়ে ? আমি চাই এর চাইতে কোন্ আর তোমার বড় সত্য আছে প্রেম ? কোন্ বড় ? আমি চাই— কেবল অশরীরী তোমাকে নয়, তোমার দেহের প্রত্যেক অণুটির জন্যে আজ আমার দেহের প্রত্যেক অণুটি উন্মাদ। এ উন্মাদকে কি দিয়ে ঠেকাবে ? এ উন্মাদকে কিসের সান্ত্বনা দেবে ? একটু হাসির ? একটু গানের ?—পাগল !

সূর্য্য ডুবে গেল, নবৎখানায় পূরবী রাগিনী বেজে উঠল, হাজার কক্ষে হাজার দীপ জ্বলে' উঠল। প্রেম পালঙ্ক থেকে নামতেই রাজপুত্র উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—"প্রেম! একদিনও কি আমার এই রাজপুরীতে রাত্রিযাপন করবে না ? অমরত্বকে কি চিরকাল এড়িয়ে চলবে ?"

প্রেম চমকে উঠল, তার শঙ্খের মত কান দুটো গোলাপের মত লাল হ'য়ে উঠল, গোলাপের মত গণ্ড দুটি শঙ্খের মত সাদা হয়ে গেল, শুকনো চোখ সজল হয়ে এলো, সরস ঠোঁট শুকনো হয়ে গেল। প্রেম তার দৃষ্টি রাজপুত্রের চোখের উপরে স্থাপিত করে' বললে—"রাজকুমার, তোমার জন্যে আমি জীবন দিতে পারি কিন্তু এখানে রাত্রিবাসের আমার উপায় নেই।"

রাজপুত্র দেখলেন প্রেমের চোখ দুটিতে কি এক দৃষ্টি, সে দৃষ্টিতে কি এক নীরব মিনতি, কি এক করুণ ভর্ৎসনা। রাজপুত্র সে দৃষ্টি সহ্য করতে পারলেন না। তাঁর দৃষ্টি অবনত হ'য়ে গেল। রাজপুত্র যখন চোখ তুললেন তখন দেখলেন তিনি একা। প্রেম কখন চলে গিয়েছে।

রাজপুত্রের অন্তরে যেন সহস্র শার্দ্দুল গর্জ্জে উঠল, লক্ষ ফণী ফণা বিস্তার করে' রক্ত চক্ষু মেলে দিল। অত্যাচার, অত্যাচার, আমি এ অত্যাচার সহ্য করব না। আমি চাই চাই-ই প্রেমকে, আরও কাছেআরও কাছে, আরও কাছে। এ চাওয়াকে চিরকাল ব্যর্থ হতে দেব না।

রাজপুত্র ডাকলেন "প্রতিহারী, প্রতিহারী।"

প্রতিহারী ত্রস্তে এসে অভিবাদন করে দাঁড়াল। রাজপুত্র খানিকক্ষণ শির নত করে' কি চিন্তা করলেন তারপর মাথা তুলে বললেন—"আচ্ছা তুমি যাও।"

রাজপুত্র সেদিন সারারাত পিঞ্জরাবদ্ধ শার্দ্দুলের মত পায়চারি করে' বেড়ালেন।

পরদিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যখন প্রেম এলো তখন রাজপুত্র তাকিয়ে দেখলেন, সে কি সুন্দর, কি স্নিগ্ধ, কি কোমল। যেন শিশির-ভেজা সদ্যফোটা পদ্মটি, সে পদ্মের পাঁপ্‌ড়িতে পাঁপ্‌ড়িতে হাসি, সে হাসির অন্তরালে অন্তরালে আমন্ত্রণ। এ কি সত্য সত্যই আমন্ত্রণ, না শুধু তাঁর নিজের প্রাণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিবিম্ব ?

দিন কেটে গেল, সূর্য্যদেব পাটে বসলেন। নবৎখানায় পূরবী রাগিনী বেজে উঠল, কক্ষে কক্ষে লক্ষ দীপ জ্বলে উঠল, প্রেম পালঙ্ক থেকে নেমে বললে—"কুমার, তবে আজ আসি।"

রাজপুত্র উঠে দাঁড়ালেন, তারপর দুই বাহু তাঁর বুকের উপরে ন্যস্ত করে বললেন—"প্রেম! আমার আদেশে আজ পুরীর সিংহ-দ্বার রুদ্ধ, আমার আদেশ ব্যতীত তা খুলবে না।"

অমনি নহবৎখানার রাগ-আলাপ থমকে গেল, পাখীদের কাকলী-রব স্তব্ধ হ'য়ে গেল, কক্ষে কক্ষে দীপশিখা সব স্থির নিস্পন্দ হ'য়ে গেল। সমস্ত রাজপুরীটার প্রত্যেক বস্তুটি যেন কান খাড়া করে' সজাগ হ'য়ে উঠল।

কক্ষতলে দু'জনে দাঁড়িয়ে রইলেন। কারো মুখে একটি কথা নেই। নিমেষের পর নিমেষ কেটে যেতে লাগল। পূর্ণিমার চাঁদ আকাশের অনেক পথ উঠে ঊর্ম্মিবালাদের গায়ে রূপোর বসন জড়িয়ে দিল। প্রেম বললে—"রাজকুমার, আমায় মুক্তি দাও।"

রাজকুমার উচ্ছসিত কণ্ঠে ব'লে উঠলেন—"প্রেম, প্রেম, যদি আমার অন্তরের তীব্র দাহ বুঝতে পারতে, যদি জানতে কেমন করে আমার হৃদ্‌পিণ্ডের পরতে পরতে সূক্ষ্ম শৃঙ্খল কেটে বসেছে, যদি জানতে"—রাজপুত্রের উচ্ছসিত কণ্ঠ ক্রমে ক্রমে উম্মাদের মত হ'য়ে উঠল, তাঁর চোখ দুটি জ্বল জ্বল করতে লাগল, রাজপুত্র দুই বাহু বিস্তার করে' গদ গদ কণ্ঠে বললেন—"প্রেম, প্রেম, এসো আজ সমস্ত দূরত্ব সমস্ত ব্যবধান নির্ব্বাসিত হোক!"

প্রেম কেঁপে উঠল, পরমুহূর্ত্তে আপনাকে সংযত করে' ছুটে পাশের দরজা দিয়ে সমুদ্রের দিক্‌কার ছাদের উপরে বেরিয়ে গেল।

রাজপুত্র ক্ষুধিত শার্দ্দূলের মত তার পিছনে পিছনে ছুটে বেরুলেন। প্রেম ছাদের আলিসাতে উঠতে-না-উঠতে বাম বাহু দিয়ে তার কটি আকর্ষণ করে' আপনার বক্ষের উপর টেনে নিলেন, রাজ-পুত্রের দক্ষিণ হস্তের নিষ্ঠুরতার নীচে তার হৃদয়পদ্ম পিষিত হ'য়ে

গেল, আর ঠোঁট দুখানির উপর রাজপুত্রের ঠোঁট দু'টি যেন একটি শেষ মৃত্যু-আলিঙ্গনে কঠিন হ'য়ে বসে' গেল।

সে চুম্বনে প্রেমের শিরায় শিরায় একটা তড়িৎ প্রবাহ উন্মাদের মত ছুটে গেল, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থর থর করে কেঁপে উঠল, সে কম্পনে তার নীবিবন্ধের গ্রন্থি শিথিল হ'য়ে গেল, ঘাঘ্‌রা খস্ খস্ করে উঠল, তারপর সর্ সর্ করে' তা প্রেমের কটিচ্যুত হয়ে খসে পড়ল।

প্রেমের কণ্ঠ থেকে একটা নিদারুণ "ওঃ" শব্দ রাজপুত্রকে যেন মুহূর্ত্তের জন্যে চেতনা ফিরে দিল, প্রেম দু'হাতে চরম শক্তি সংগ্রহ করে' রাজপুত্রকে ঠেলে দিলে, তারপর দু'হাতে চোক মুখ ঢেকে শির অবনত করে' দাঁড়িয়ে রইল।

রাজপুত্র তখন দেখলেন তাঁর সামনে নগ্ন নারী মূর্ত্তিটিকে। দেখতে দেখতে, দেখতে দেখতে তাঁর সমস্ত দেহ স্থির নিশ্চল নিস্পন্দ হ'য়ে গেল, তাঁর চোখ দুটি ধীরে ধীরে, ধীরে ধীরে পাথরের মত কঠিন হ'য়ে উঠল।

রাজপুত্র দেখলেন সেই নগ্ন মূর্ত্তিকে। দেখলেন মাথা থেকে কটি পর্য্যন্ত পরিপুষ্ট সুন্দর এক বালিকা মূর্ত্তি, আর কটি থেকে নেমেছে একটি নিটোল নিরেট শল্কাবৃত মৎসপুচ্ছ।

প্রেম ধীরে ধীরে মাথা তুলল। তারপর বিশ্বের বেদনার কণ্ঠ নিয়ে বললে—"রাজকুমার, আমি অর্দ্ধেক নারী অর্দ্ধেক মাছ, অর্দ্ধেক মানুষ অর্দ্ধেক পশু। আমার যে অংশ পশু সে অংশকে আমি অতি যত্নে তোমার কাছ থেকে গোপন করে' রেখেছিলেম, সেই পশুকে

আজ তুমি অনাবৃত করলে, আর আমার সাধ্য নেই তোমার জীবনে স্বর্গের পরশ ব'য়ে আনতে, আজ এইখানে আমাদের চির বিদায়।"

রাজপুত্র স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মৎস্যনারী ধীরে ধীরে আলিশার উপর উঠে আপনাকে নীচ সাগরে ছেড়ে দিল। মুহূর্ত্তে চাঁদের কিরণে মৎস্যপুচ্ছের আঁশগুলো চিক্‌মিকিয়ে উঠল, তারপর ঝাপ করে' একটা শব্দ হল, মুষ্টিখানেক হীরকচূর্ণ চারিদিকে ছড়িয়ে গেল, এক নিমেষ তরে জলবুদবুদেরা পুঞ্জ বাঁধল, তারপর সাগর-বুকের সেই চিরন্তনের গান----

ডুল্‌বি ওরে ডুল্‌বি যদি আমার সুনীল দোলাতে।---

রাজপুত্র কাঁদতে কাঁদতে ছাদ থেকে ভিতরে ফিরলেন। ভিতরে এক পা ফেলতেই রাজপুত্র থম্‌কে দাঁড়ালেন। কোথায়, কোথায়? সে কক্ষে কক্ষে দীপের মালা, সে পিঞ্জরে পিঞ্জরে পাখী, দাঁড়ে দাঁড়ে টিয়ের দল! চারিদিকে নিস্তব্ধ নিঝুম, চারিদিকে আঁধার। রাজপুত্র ছুটে নীচে নামলেন, কোথায় সে দাস দাসী শান্ত্রী প্রহরী দ্বৌবারিক প্রতিহারী সব শূন্য, কোথায়ও একটি জনপ্রাণী নেই, রাজপুত্র গিয়ে দেখেন হাতীশালে একটি হাতী নেই একজন মাহুত নেই, ঘোড়াশালে একটি ঘোড়া নেই একজন শোয়ার নেই, নহবতে রসুনচৌকি নেই। রাজপুত্র রাজপ্রাসাদে ফিরে এলেন চারিদিক শূন্য নিঝুম, নিঝুম চাঁদের আলো থামের ফাঁকে ফাঁকে আড় হয়ে এসে মেঝেয় পড়ে চারিদিক আরও নিবিড় আরও গভীর করে' তুলেছে। রাজপুত্র হাজার মণ পাথর পায়ে নিয়ে যেন ধীরে ধীরে অতি কষ্টে সিঁড়ি

ভেঙে দ্বিতলে উঠলেন, তারপর পালঙ্কে গিয়ে আকুল হয়ে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর দীর্ঘ প্রকাণ্ড নিশ্বাসে নিশ্বাসে প্রকাণ্ড রাজপুরী গম্‌থমে হ'য়ে উঠল।

সমুদ্রের ডাক।

সাঁইত্রিশ বৎসর বয়সে দক্ষিণা যখন পুত্র সন্তানটী প্রসব করলে তখন তাদের সেই এতদিনকার বিষাদঘেরা কুটীর খানি আনন্দের আলোতে হেসে উঠ্‌ল। সাগরের কিনারে তাদের কুটীর। আবহমান-কাল থেকেই ত নীলাম্বুরাশি উচ্ছসিত—সৃষ্টি হতেই ত তার তরঙ্গ-মালা কল কল ছল ছল মুখর—আজও তাই। তবে সে তরঙ্গমালার কল কল ধ্বনিতে আজ এত আনন্দ-মদিরা ঢেলে দিলে কে? নীলাম্বু-রাশির সে উচ্ছাস আজ এত হাস্য-মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌ল কেন? কুটীরের আশে পাশে তালবৃক্ষের সারি। বাতাসে তালবৃন্ত থির থির করে কাঁপছে—কিন্তু তা আজ এত উল্লাস-যুক্ত হ'ল কোন্ মন্ত্রে? দক্ষিণা যখন তার সাঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করল তখন এমনি করে মৎসজীবীর সেই নির্জ্জন শান্ত অথচ বিষাদ-মাখা কুটীরখানি আকাশ বাতাস দশদিক ভরে একেবারে হেসে উঠ্‌ল।

দক্ষিণা যখন পুত্র সন্তানটি প্রসব করলে তখন শ্রীমন্তের হৃদয়-খানি ভক্তিতে ভরে' উঠ্‌ল এবং তারই আলোক তার চক্ষু দুটিকে উদ্ভাসিত করে' তুল্‌ল। দেবতার দয়া তার অন্তরের অন্তস্থলে গিয়ে স্পর্শ করে' শ্রীমন্তের জীবনকে এক মুহূর্ত্তে কৃতার্থ করে' দিল।

জোড়করে আকাশের পানে চেয়ে গদগদভাষে শ্রীমন্ত বল্‌ল—"দেখো ঠাকুর! আমার খোকাকে যেন বাঁচিয়ে রেখ—দেখো যেন আকাশের চাঁদ হাতে দিয়ে আবার তা কেড়ে নিয়ো না"—শ্রীমন্তের মুখে আর কথা সরল না—তার কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে এল—অন্তরের ভাব, ভাষা খুঁজে পেলে না!

যথাসময়ে অন্নপ্রাশনের সঙ্গে শিশুর নামকরণ হ'য়ে গেল। দেবতার দান বলে' তার নাম রাখা হ'ল প্রসাদ'। যেদিন শিশু প্রথম আধ আধ কথায় মা ও বাবা ডাক্‌তে শিখল, সেদিন দক্ষিণা ও শ্রীমন্তের বুকের ভিতরটা আশায় আনন্দে কেঁপে উঠল—এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের চোখের সামনে একটা নতুন জগৎ খুলে গেল। যে জগতে পিতৃ-মাতৃ হৃদয়ে এত স্নেহ এত ভালবাসা—সে-জগতের ত কঠোর হবার অবসর নেই। যে সংসারে শিশু রয়েছে—তার আধ আধ কথা রয়েছে—কালো চোখের হাসিমাখা দৃষ্টি রয়েছে—সে সংসারের ত নির্ম্মম হবার সাহস নেই। শ্রীমন্তের মরুভূমির মতো সংসার এক মুহূর্ত্তে যেন মন্দাকিনী প্রবাহে কুমদলশোভিত হ'য়ে গেল। আর সে ক্লান্তি নেই, দুঃখ নেই, দৈন্য নেই—আর সে ব্যর্থতা নেই। শিশুর আনন্দময় স্পর্শে সমস্তই ধন্য ও সার্থক হ'য়ে উঠল।

প্রতিদিনের কাজগুলো যা এতদিন শ্রীমন্ত ও দক্ষিণার কাঁধে ভূতের বোঝার মতো চেপে তাদের জীবনকে এখানে সেখানে নির্ম্মম ভাবে টেনে নিয়ে বেড়াত, সে ভার শুধু একটী মাত্র শিশুর আবির্ভাবে একেবারে লঘু হ'য়ে গেল। শ্রীমন্ত যখন জাল কাঁধে নিয়ে মাছ মার্‌তে যায় তখন তার হৃদয়টা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতোই আজকাল নৃত্য

করতে থাকে—শ্রীমন্ত তখন ভাবে যে এই দিনমানব্যাপী পরিশ্রমের যে পুরস্কার, সে পুরস্কার এ পরিশ্রমের তুলনায় অনেক বেশী। সে পুরস্কার একটি ক্ষুদ্র শিশুর স্পর্শ—একটি ক্ষুদ্র শিশুর মুখে বাবা-ডাক। দক্ষিণা যখন রন্ধনে যায় তখন আর সে তা যন্ত্রবৎ সম্পাদন করে না। রন্ধনের প্রতি ব্যঞ্জনটি যে, একটি ক্ষুদ্র শিশুর আনন্দের সামগ্রী হবে! সমস্ত দিনটার দিকে চেয়ে দক্ষিণার আর তা মরুভূমি বলে' মনে হয় না। সমস্ত দিনমান যে সে অনেকগুলো স্নেহের কাজের অধিকারিণী। শিশুকে স্নান করান—আহার করান—ঘুম পাড়ান তা যে দক্ষিণাকেই করতে হবে। ধন্য ভগবান! যিনি শিশুকে অসহায় করে' এখানে এনেছেন। পিতামাতা একটি ক্ষুদ্র শিশুর কাছ থেকে যে কতখানি আনন্দ কুড়িয়ে নেয় তা শিশুও বোঝে না আর পিতামাতাও জানে না।

প্রসাদ ধীরে ধীরে ছ' বছরে পড়্‌ল।

একদিন রাতে ঘরের ভিতরে অসহ্য গরম বোধ হওয়ায় দক্ষিণা ঘরের দাওয়ায় একখানি মাদুর বিছিয়ে শয়ন করেছে। পাশে প্রসাদ। ভোরের মুখে দক্ষিণার ঘুম ভেঙে গেল। তখন একটি মাত্র কাক ডেকেছে—সমুদ্রের আর আকাশের যেখানে মিলন হয়েছে সেখানে কেবল একটি মাত্র রেখা শুভ্র হ'য়ে উঠেছে। শ্রীমন্ত তারও আগে জাল নিয়ে বেরিয়ে গেছে। দক্ষিণা তাড়াতাড়ি উঠ্‌তে যাচ্ছে, হঠাৎ চোখ পড়ে' গেল প্রসাদের মুখের উপর। দক্ষিণার আর ওঠা হল না। প্রসাদকে ত সে এমন কোন দিন দেখে নি! নিদ্রিত শিশুর হাত দুটো সন্তর্পনে তার বুকের ওপর ন্যস্ত। চোখ দুটো ফুলের

পাঁপড়ির মতো নিমীলিত। আর ঠোঁট্ দুখানিতে একটি মৃদু—অতি মৃদু হাসির রেখা। দক্ষিণা কি প্রসাদকে আর কোন দিন নিদ্রিত অবস্থায় দেখে নি?—দেখেছে; কিন্তু সে প্রসাদে আর এ প্রসাদে যেন আকাশ পাতাল তফাৎ। আর কি কোন দিন সে প্রসাদকে হাস্‌তে দেখে নি?—দেখেছে; কিন্তু সে হাসিতে আজকার এই নিদ্রিত শিশুর মৃদু হাসিটুকুতে যে কি প্রভেদ তা দক্ষিণা বল্‌তে পারে না—কিন্তু সে-হাসি আর এ-হাসি এক নয়। এ কি দক্ষিণার পুত্র—না কোন দেবশিশু! এ কি এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর ক্ষুদ্র পিতা মাতার স্নেহাবদ্ধ সন্তান—না অনন্ত আকাশের কোন জীব! এ কি মর্ত্ত্যের মানুষ—না স্বর্গের দেবতা! দক্ষিণার কেমন ভয় করতে লাগ্‌ল। তাড়াতাড়ি ডাক্‌ল—"প্রসাদ, প্রসাদ!"

দক্ষিণার ডাকে যখন প্রসাদের ঘুম ভেঙে গেল তখন সে চারিদিকে চেয়ে প্রথম কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ল না, তারপর হঠাৎ তার মাকে দেখ্‌তে পেয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে' বল্‌ল—"জানিস্ মা ভারি একটা মজার স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম।

দক্ষিণা শিশুকে বক্ষে চেপে তার দুই গালে হাত বুলিয়ে বুঝ্‌ল এ তারই প্রসাদ বটে—জিজ্ঞেস্ কর্‌ল—"কি স্বপ্ন বাবা?"

"ভারি মজার স্বপ্ন মা! সে কি যেন কেমন—একদিন যেন আমি খেল্‌ছিলাম—সেখানে সবাই আছে মা নরু অনঙ্গ বৈকোণ্ঠো শশী তারক—সবাই। হঠাৎ দেখি কেউ নেই! একলা আমি খালি দাঁড়িয়ে আছি—আর আমার সাম্‌নে মা খালি নীল—আর নীল—আর নীল! আর সেখানে থেকে কে যেন খালি ডাক্‌ছে—"প্রসাদ প্রসাদ,"

আমি উত্তর দিতে যাই আর পারি না—হাঁট্‌তে যাই হাঁট্‌তেই পারি না। আচ্ছা স্বপ্নে এ রকম হয় কেন মা? হাঁটতে গেলে হাঁট্‌তে পারি না—কথা বল্‌তে পারি না?"

"কি জানি বাবা কেমন করে' বল্‌ব স্বপ্নে কেন ওরকম হয়।"

"তারপর আরও কত যেন কি—সব আমার মনে নেই। কত যেন সুন্দর সুন্দর দেশ—কত ঘর বাড়ী—ফুল ফল—কত যেন কি। সে এমন সুন্দর—সব বুঝি পরীদের দেশ—পরীদের দেশ কোথায় মা?"

"কি জানি বাবা তাদের দেশ কোথায় তা ত কেউ জানে না। তারা থাকে আকাশে—আকাশে আকাশেই ঘুরে বেড়ায়—তাদের দেশ কোথায় তা ত কেউ জানে না।"

প্রসাদ সন্দেহাকুল চিত্তে আকাশের দিকে চেয়ে দেখ্‌ল। শিশুর চোখে পড়্‌ল শুধুই আকাশ—অনন্ত শূন্য—আর কিছুই না। শিশু একটু ম্রিয়মান হ'ল। হায় পরীদের দেশ কোথায় তা কেউই জানে না!

সে-দিন রাত্রিতে ভীষণ তুফান উঠ্‌ল। কালো কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল—থেকে থেকে বিদ্যুৎ তাদের গায়ে দাঁত বসিয়ে দিতে লাগ্‌ল। দিগন্তের পার থেকে সাঁ সাঁ করে' বাতাস ছুটল—সেই বাতাসের নাড়া খেয়ে লক্ষ ঢেউ যেন লক্ষ নিদ্রিত অজগরের মতো জেগে উঠে, তাদের লক্ষ ক্রুদ্ধ ফণা তুলে বেলাভূমে আছ্‌ড়ে আছ্‌ড়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি! অৰ্দ্ধপ্রহর রাত থাক্‌তে জল-ঝড় থেমে গিয়ে, প্রকৃতি শান্তমূর্ত্তি ধারণ কর্‌ল। দক্ষিণার যখন

ঘুম ভাঙ্‌ল তখন পূর্ব্বদিকে ক্ষীণ ঊষার আলো দেখা দিয়েছে—আঁধার তখনো গাছে গাছে, তাদের ডালপালার পাশে পাশে, ঘরবাড়ীর কোণে কোণে আশ্রয় খুঁজে আরোও কিছুকাল থাক্‌বার প্রয়াস পাচ্ছিল। দক্ষিণা উঠে ছড়া দিয়ে উঠান ঝাঁট দিল। তখন চারিদিক বেশ ফরসা হয়ে এসেছে। দক্ষিণা গিয়ে প্রসাদকে ডেকে তুল্‌ল—বল্‌ল—"কাল রাত্রে ঝড় হ'য়ে গিয়েছে—চল্‌, ঝিনুক কুড়ুতে যাবি নে?" প্রতি ঝড়ের শেষে সমুদ্রের প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে যে-সব মরা ঝিনুক ইত্যাদি বেলা-ভূমে পড়ে থাক্‌ত দক্ষিণা তা কুড়িয়ে বেশ দু' পয়সা উপায় করত। কখনও কখনও বা দু' একটা বড় শঙ্খ বা কড়িও মিলে যেত। তা অবস্থাপন্ন গৃহস্থেরা বেশ দাম দিয়ে কিনে নিত। দক্ষিণা তাড়াতাড়ি প্রসাদকে কাপড় পরিয়ে দিল। তারপর কুটীরের দরজাটি টেনে দিয়ে মাতা এবং পুত্রে বের হ'য়ে পড়ল।

ছোট বড় নানা রঙের নানান্‌ আকৃতির ঝিনুকে যখন দক্ষিণার ঝাঁকাটী পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল সমুদ্রগর্ভস্থিত সূর্য্যের ক্রুদ্ধ রশ্মিগুলো পূর্ব্বদিগন্তে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মেঘমালা তীরের মতো ভেদ করে', ঊর্দ্ধে নীলিমায় আপনাদের ছড়িয়ে দিয়েচে। ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে তারা সমুদ্রের ধারে ধারে অনেক দূর গিয়ে পড়েছিল। ফিরবার পথও সেই সমুদ্রের ধারে ধারে। দক্ষিণা বাম কাঁকালে ঝিনুকপূর্ণ ঝাঁকাটি বহন করে', দক্ষিণ হস্তে প্রসাদের ক্ষুদ্র হস্তটী ধারণ করে' ছেলের সঙ্গে গল্প কর্‌তে কর্‌তে বাড়ী ফিরে চল্‌ল।

মাতা পুত্রে কথোপকথন করতে কর্‌তে চল্‌ছিল আর শিশুর চঞ্চল চোখ দুটী এদিক সেদিক ফিরছিল। একবার প্রসাদ সমুদ্রের

দিকে চেয়ে দেখে, তারপর বলে উঠ্‌ল—"দেখ্‌ দেখ্‌ মা কেমন একখানা জাহাজ কতদূর দিয়ে ছুটে চলেছে"—কিন্তু পরক্ষণেই তার উত্তেজিত অঙ্গুলি দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে' একেবারে দাঁড়িয়ে গেল—শিশু যেন কি স্মরণ করবার চেষ্টা করতে লাগ্‌ল। সহসা আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে বলে উঠ্‌ল—"মা জানিস!"

দক্ষিণাও প্রসাদের সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল—বল্‌ল "কি বাবা?"

"সেই যে সে-দিনকার স্বপ্ন।"

"হাঁ বাবা"

"খালি নীল—আর নীল—আর নীল!"

"হাঁ বাবা"

শিশু তার ক্ষুদ্র হস্তের ক্ষুদ্র অঙ্গুলি সমুদ্রের দিকে প্রসার করে' বল্‌ল—"সে যেন ঐ রকম মা।"

"ছি ছি বাবা স্বপ্ন সব মিথ্যে। স্বপ্নের কথা মনে করে' রাখ্‌তে নেই।"

দক্ষিণা প্রসাদকে টেনে নিয়ে গৃহ-অভিমুখে অগ্রসর হ'ল। শিশুও অন্যমনস্ক ভাবে মায়ের সঙ্গে সঙ্গে চল্‌ল। সে মনে ভাবলে হায়! স্বপ্ন সব মিথ্যে! এমন মজার জিনিষগুলো মিথ্যে হয় কেন? এই ভেবে সে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হ'ল।

সে দিন বেলা এগারটা বেজে গিয়েছে। গ্রামের উপকণ্ঠে যে মস্ত ছাতিম গাছটা ছাতার মতো ডাল বিস্তার করে' পাতা বিছিয়ে দিব্যি ছায়া করে' দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে তখনকার মতো খেলা

ধুলো সাঙ্গ করে' ছেলেরা যে যার মতো গৃহে ফিরেছে। কিন্তু প্রসাদের আর সে দিন দেখা নেই। দক্ষিণা রান্না শেষ করে' তেলের বাটী নিয়ে প্রসাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল! ধীরে ধীরে যখন উঠানের কোণের ডালিম গাছটার ছায়া তার গায়ে মিশে গেল অথচ প্রসাদ ফিরল না তখন দক্ষিণা তার খোঁজে চলল। দক্ষিণা সহজেই মনে করল যে প্রসাদ হয়ত আর কোন বালকের সঙ্গে তাদের বাড়ীতে গিয়েছে। কিন্তু যখন সমস্ত প্রতিবেশীদের বাড়ীতে ঘুরে ঘুরে প্রসাদের খোঁজ মিলল না তখন তার মার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠল। কিন্তু দক্ষিণা আবার মনে করল যে হয়ত প্রসাদ এতক্ষণ ঘরে ফিরেছে। এই মনে করে' দক্ষিণা দ্রুতপদে গৃহে প্রত্যাগমন করল। না,—কুটীরের দ্বার তেমনি রুদ্ধ। কেউ কোথাও নেই। আশে পাশে কোনখানে প্রসাদ থাকতে পারে মনে করে' দক্ষিণা উচ্চৈঃস্বরে ডাকল "প্রসাদ প্রসাদ", কোন উত্তর নেই। প্রসাদ ফেরে নি।

ত্রস্তপদে দক্ষিণা আবার বাটী থেকে বহির্গত হ'ল। আবার পাড়া প্রতিবেশীদের বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগল। কোথাও প্রসাদ নেই। এমনি করে, যখন দক্ষিণা চতুর্থবার গৃহ থেকে গৃহান্তরে কেঁদে কেঁদে প্রসাদের খোঁজ করে' বেড়াচ্ছিল তখন একটি ছোটছেলে দক্ষিণাকে বলল যে, প্রসাদ খেলার মাঝখানে ছাতিমতলা থেকে চলে' গিয়েছিল—আর তার যদ্দুর মনে পড়ে তাতে সে প্রসাদকে ছাতিমতলা থেকে যে পথটা সমুদ্রের দিকে গিয়েছে সেই পথ ধরে' যেতে দেখেছে। দক্ষিণা মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা না করে'

দেবতার কাছে নানা মানত করতে করতে চল্‌ল। ছাতিমতলায় এসে দেখ্‌ল সে স্থান জনশূন্য। দক্ষিণা সেখান থেকে যে পথ সমুদ্রের দিকে গিয়েছে সেই পথ ধরে' চল্‌ল। কিছুকালের মধ্যে দক্ষিণা সমুদ্রের ধারে এসে উপস্থিত হ'ল। সেখানে এসে সে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে' যা দেখল তাতে তার চক্ষুস্থির হ'য়ে গেল!

দক্ষিণা দেখ্‌ল সমুদ্রের ধারে একখানে বন্য ঝাউ আর নারিকেল গাছে একটা কুঞ্জের মতো সৃষ্ট হয়েছে—আর সেখানে প্রসাদ একটি ঝাউয়ের গায়ে হেলান দিয়ে বসে' একদৃষ্টে সমুদ্রের দিকে চেয়ে আছে। মধ্যাহ্ন-সূর্য্য-উদ্দীপ্ত আকাশ সমুদ্রকে একটা অতি মনোরম চোখজুড়ান নীল রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে। গত রাত্রির ঝঞ্ঝা-তাড়িত উর্ম্মিমালা এখনও যেন তাদের তাল সাম্‌লিয়ে উঠ্‌তে পারে নি—তাই তখন তারা গর্জ্জে' গর্জ্জে' বেলাভূমে এসে প্রতিহত হ'য়ে ফিরছিল। আর তারই উপকূলে ছায়া-সুনিবিড় কুঞ্জতলে ক্ষুদ্র শিশু আপনার ক্ষুদ্র দুটী হাতে ক্ষুদ্র দুটী হাঁটু জড়িয়ে ধরে বসে বসে তাই দেখছিল; শিশু পলকহীন—নির্ব্বাক—নিস্তব্ধ!

দক্ষিণা তাড়াতাড়ি অগ্রসর হ'য়ে প্রসাদকে কি ভৎর্সনা করতে যাচ্ছিল, কিন্তু প্রসাদ মানুষের পায়ের শব্দ শুনে চম্‌কে চেয়ে দেখল, তারপর মাকে দেখে তৎক্ষণাৎ দৌড়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল ও উত্তেজিত ভাবে বল্‌লে—"মা মা শুন্‌ছিস্ কি মা?"

শিশুকণ্ঠের মা-ডাকে মাতার মনের ক্রোধ মুহূর্ত্তে চোখের জলে পরিণত হয়ে গেল। দক্ষিণা প্রসাদকে বক্ষে তুলে নিয়ে মুখচুম্বন করে' জিজ্ঞেস করল—"কি বাবা?"

প্রসাদ তেমনি উত্তেজিত কণ্ঠে বল্‌ল—"ঐ শোন্ শোন্ মা সমুদ্র কেবলি ডাক্‌ছে—'প্রসাদ প্রসাদ।' শুনিস্ না কি মা তুই ?"

শিশুর কথা শুনে দক্ষিণার বুক দুর্‌দুর্ করে' কেঁপে উঠল। কোন্ অজ্ঞাত আশঙ্কার আশু সম্ভাবনায় তার চিত্ত মন প্রাণ খিন্ন হয়ে উঠল। দক্ষিণা বল্‌ল—"ছিঃ বাবা পাগলামি করে না। সমুদ্র কি ডাক্‌তে পারে! ও যে ঢেউয়ের শব্দ।"

দক্ষিণা প্রসাদকে কোলে নিয়ে বাড়ী ফির্‌ল।

এর পর থেকে সুযোগ পেলেই প্রসাদ সেই ঝাউকুঞ্জতলে গিয়ে বসে একদৃষ্টে সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকত! এই ক্ষুদ্র শিশুটী সমস্ত খেলাধূলা ফেলে, একা একা সমুদ্রের দিকে চেয়ে কি ভাবে তা কে জানে? সিন্ধুর ছলছলয়িত কলরোল সে ক্ষুদ্র হৃদয়ের পরতে পরতে কোন্ ভাবের তরঙ্গ তুলে যায় তা কে বল্‌তে পারে? কে জানে কোন্ রহস্যের যবনিকা ভেদ করে' কোন স্বপ্নের সন্ধানে শিশু তার কালো চোখের নির্ম্মল দৃষ্টি সীমাহীন দিগন্তে বদ্ধ করে' সিন্ধুকূলে বসে থাকে? কেউ জানে না। শিশু কি জানে? কে জানে শিশু জানে কি না। কিন্তু তবুও শিশু যায়। একা একা—সমস্ত ছেড়ে খেলাধূলো হাসি-গল্প সমস্ত পরিত্যাগ করে' শিশু যায়, সেই ঝাউকুঞ্জ-তলে আপনাকে ভুলিয়ে দিতে—ভাসিয়ে দিতে—ডুবিয়ে দিতে! ক্রমে ক্রমে দক্ষিণা যখন জান্‌ল যে, প্রসাদ খেলবার নামে প্রকৃতপক্ষে সমুদ্রের ধারে গিয়ে একা একা বসে' থাকে, তখন সে প্রসাদকে প্রথমে মিষ্টি কথায় তারপর ভৎসনায় ও অবশেষে ভয়প্রদর্শনে সেখানে যেতে নিরস্ত করতে চেষ্টা কর্‌ল কিন্তু যখন দেখল কিছুতেই

কিছু হ'ল না তখন দক্ষিণা হতাশ হয়ে শ্রীমন্তকে একে একে সব কথা বল্‌ল।

এর পর থেকে প্রসাদের বাহুমূল ও কণ্ঠদেশ ত্রিকোণ চতুষ্কোণ ঢোলোকাকৃতি নানা বর্ণের নানা রকমের কবজে ও তাবিজে ভরে' উঠতে লাগল। কত জনের কত মন্ত্র ঔষধী ইত্যাদির ছড়াছড়ি হতে লাগ্‌ল। কিন্তু প্রসাদের মনের কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। ফাঁক পেলেই সে ঐ ঝাউকুঞ্জতলে গিয়ে একলা সমুদ্রের দিকে পলক-হীন নেত্রে চেয়ে থাকে—বুঝি কান পেতে কি শুন্‌তে থাকে। এই রকমে যখন কিছুতেই কিছু হল না—তখন শ্রীমন্ত ও দক্ষিণা পরামর্শ করতে বস্‌ল। অনেক কথাবার্ত্তার পর ঠিক হল যে, দক্ষিণা প্রসাদকে নিয়ে তার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে গিয়ে কিছুদিন থাকবে। সে আত্মীয়ের বাড়ী সমুদ্রের উপকূল থেকে দশ ক্রোশ দূরে। আর শ্রীমন্ত মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে প্রসাদকে দেখে আস্‌বে। তারপর একটি শুভদিন দেখে দক্ষিণা ও প্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীমন্ত সেই আত্মীয়ের বাড়ীতে ছেলেকে রেখে তার নির্জ্জন কুটীরখানিতে ফিরে এল।

পৃথিবীর বুকে পুরোণো দাগ মিশিয়ে নতুন দাগ বসিয়ে দশ বছর কেটে গেল। শ্রীমন্ত যখন একদিন দক্ষিণা ও প্রসাদকে সেই আত্মীয়ের বাড়ী থেকে ফিরিয়ে আন্‌তে গেল তখন প্রসাদের ছেলেবেলার খেয়ালের কথা সবাই ভুলেছে—ভোলে নি শুধু দক্ষিণা। তাই দক্ষিণা যখন শ্রীমন্তকে সে-কথা স্মরণ করিয়ে দিল—তখন দক্ষিণা যে নিতান্তই একটা পাগলী সেই কথাটাই শ্রীমন্ত তাকে

বুঝিয়ে দিল। আরও বুঝিয়ে দিল যে শ্রীমন্তের এখন বয়েস হয়েছে—কবে পরপারের ডাক অস্‌বে তার ঠিক নেই—প্রসাদকে পৈতৃক ব্যবসাটা ত শিখতে হবে—খাওয়া পরার উপায়টা ত করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই শুভদিন দেখে প্রসাদ ও দক্ষিণা শ্রীমন্তের সঙ্গে আবার তাদের সমুদ্রের ধারে কুঁড়ে ঘরটিতে ফিরে এল। দক্ষিণা হৃষ্ট হয়ে দেখল যে সমুদ্র দেখে প্রসাদের কোনই ভাবান্তর হল না। তিন মাসের মধ্যে শ্রীমন্তের শিক্ষায় প্রসাদ একজন পাকা মাঝি হয়ে উঠল—জাল টান্‌তে, দাঁড় ফেল্‌তে, পাল খাটাতে প্রসাদের সমকক্ষ আর কেউই সেই ধীবরপল্লীতে রইল না।

সেদিন বৈশাখী পূর্ণিমা। রাত্রির এমন রূপ আর কেউ কখনও দেখেনি। লক্ষ পরী বুঝি সেদিন আকাশপথে তাদের প্রিয়ের উদ্দেশে অভিসারে বেরিয়েছিল—আর তাদের লক্ষ গা থেকে বুঝি রূপোর স্বচ্ছ তরল রাগ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল—তাদের লক্ষ হৃদয়ের প্রেমের অনুভব বুঝি আকাশে বাতাসে পৃথিবীর জলে স্থলে বিছিয়ে যাচ্ছিল—তাদের দু'লক্ষ পায়ের নূপুরের "যে-গান কানে যায় না শোনা"—তাই বুঝি দিগন্তের গায়ে গায়ে মাতলামি করে ফিরছিল।

সেদিন রাত্রে খাওয়া দাওয়া শেষ করে যখন প্রসাদের কাঁধে জাল চাপিয়ে আপনার কাঁধে দাঁড়, পাল্‌ ও পাল তুলবার খুঁটিটা নিয়ে শ্রীমন্ত গৃহ থেকে বের হল তখন পূর্ণিমার পূর্ণ চাঁদ আকাশে অনেকখানি উঠে গেছে। তারা দু'জনে সমুদ্রের কিনারে এসে তাদের তিন খণ্ড লম্বা পুরু তক্তায় বাঁধা ভেলাটা ডাঙ্গা থেকে

জলে নামিয়ে দিল। তারপর পাল খাটাবার খুঁটিটা ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিয়ে পাল খাটিয়ে দিল—ভেলা অনুকূল বাতাসে তর-তরিয়ে দিগন্তের পাণে—যেন উড়ে গেল—ভেলার পিছন দিকটায় প্রসাদ বৈঠা হাতে তার মাথা ঠিক রাখতে লাগল আর তার আগায় বসে' শ্রীমন্ত জালটা গুছিয়ে রাখতে লাগল।

সেদিন সাগরে রূপোর ও রূপের বাণ ডেকেছিল। দুধের চাইতেও সাদা রূপোর পাত গায় জড়িয়ে রূপসী উর্ম্মিবালারা চিক্-চিক্ ঝিক্-ঝিক্ করছিল—খিল্ খিল্ করে' হেসে লুটোপুটি খাচ্ছিল। তীরের গাছগুলো যখন ঝাপসা হয়ে এল তখন ভেলার পাল নামিয়ে নেওয়া হল। তারপর ভেলার পিছন দিকটায় বসে প্রসাদ একটু একটু করে বৈঠা মারতে লাগল আর গলুইয়ের কাছে স্তূপাকৃতি করা জালটা শ্রীমন্ত, ভাঁজ খুলে খুলে জলে নামিয়ে দিতে লাগল।

"জানিস্ প্রসাদ, পূর্ণিমে রাত্তিরে যেমন জালে গল্দা চিংড়ি পড়ে তেমন আর কখনও না। আর চাঁদ্নী রাত যদি মেঘলা মেঘলা হয় তবে কাঁকড়ার লেখাজোকা নেই", শ্রীমন্ত জাল ফেল্‌তে ফেল্‌তে অজস্র ব'কে যাচ্ছিল আর প্রসাদ তাই নির্ব্বাক হয়ে শুনে যাচ্ছিল। "জানিস্ রে প্রসাদ সেই যেবার আমি তোর মাকে বিয়ে করলাম—সেই সেবার যে এই খানটাতে কোথা থেকে এক পাল হাঙ্গর এসে পড়ল—" "প্রসাদ প্রসাদ" প্রসাদের কানে এসে বাজল, কে যেন ঠিক তার পিছন থেকে তাকে ডাকল—"প্রসাদ প্রসাদ।" প্রসাদ চমকে পিছন ফিরে চেয়ে দেখল। কই, কেউ ত

নেই! প্রসাদের সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। প্রসাদের মনে পড়ে গেল একটা বহু দিনের কথা—বহুদিনের স্বপ্ন—বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা। দশ বছর ধরে যার ওপরে বিস্মৃতির কালো পরদা পড়েছিল তা এক মুহূর্ত্তে কোথায় সব ছিন্ন ভিন্ন করে' বেরিয়ে এলো মুক্ত স্পষ্ট উজ্জ্বল। প্রসাদ শ্রীমন্তের দিকে ফিরে দেখল। বৃদ্ধ তেমনি আপন মনে জাল ফেলছিল আর কত কালের কত কথা বলে' বলে' যাচ্ছিল! "প্রসাদ প্রসাদ।" প্রসাদ ফিরে চাইল। সহস্র সহস্র তরুণীর মতো অজস্র ঊর্ম্মিবালার কল কল ছল ছল হাসি—ঐ যে তারাই ডাক্‌ছে—"প্রসাদ প্রসাদ।" চাঁদের আলোয় চিক্ মিক্ করে উঠে ঐ যে তাদের তরলিত তনু বিভঙ্গিত করে তাদের কমকণ্ঠে ডাক্‌ছে—"প্রসাদ প্রসাদ।" ঐ যে সহস্র কিশোরীর কলহাসির মতো, সহস্র রূপসীর রূপরাশির মতো মাদকতা ছড়িয়ে দিয়ে ডাক্‌ছে—"প্রসাদ প্রসাদ।" এ তাদের কিসের আমন্ত্রণ? কোথায় নেবে তারা? সিন্ধুর কোন্ অতল তলে? কোন্ রহস্য যবনিকার অন্তরালে? ঐ যে তরঙ্গটি ভেলার গায়ে প্রতিহত হয়ে ফিরে গেল সে ডাক্‌ল—"প্রসাদ প্রসাদ।" ঐ যে লহরীটি বহুদূর হতে দৌড়ে এসে ভেলার কিনারে কিনারে লুটিয়ে গেল, সে ডাকল—"প্রসাদ প্রসাদ।" প্রসাদ শ্রীমন্তের দিকে চেয়ে দেখল। বৃদ্ধ তেমনি তার দিকে পিঠ ফিরে জাল ফেলছিল। প্রসাদ ধীরে ধীরে নিঃশব্দে তার হাতের বৈঠাটা ভেলার ওপরে রেখে দিল। তারপর ধীরে ধীরে তার দু'পা জলে নামিয়ে দিল। ধীরে ধীরে ভেলার কাঠ ধরে আপনাকে জলে নামিয়ে দিল। কোমর, বুক, কণ্ঠ, চিবুক, নাসিকা,

চক্ষু, ললাট, মস্তক, মস্তকের কেশরাশি ধীরে ধীরে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। দ্বিগুণ উৎসাহে লক্ষ লক্ষ উর্ম্মিবালারা চিক্-চিক্ ঝিক্-ঝিক্ করে উঠল—যেখানটায় সাগরের বুক চিরে প্রসাদের সমস্ত শরীরটা অদৃশ্য হয়ে গেল সেখানটার উপর দিয়ে মহাছুটোছুটি লাগিয়ে দিল আর খিল্-খিল্ করে' হাসতে লাগল।

"বৈঠে ঠেলছিস্ না ক্যান্ রে প্রসাদ ?" যখন প্রসাদের কোন উত্তর মিল্‌ল না, তখন শ্রীমন্ত মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখ্‌ল—দেখ্‌ল শুধু শূন্য—প্রসাদ যেখানটায় বসে' ছিল সেখানটা শূন্য—সমস্ত ভেলাটাই শূন্য—শুধুই শ্রীমন্ত—আর কেউ নেই !

মুহূর্ত্তে শ্রীমন্তের হৃদয় থেকে একটা তপ্ত আগুনের ঝলক্ উঠে তার সমস্ত শিরায় শিরায় ছড়িয়ে গেল। শ্রীমন্তের হাত থেকে জালের দড়ি খসে' পড়ল ! মন্ত্রমুগ্ধের মতো উঠে দাঁড়িয়ে সংজ্ঞালুপ্ত চোখ দুটো দিয়ে প্রসাদ যেখানটায় বসে ছিল সেখানটায় অর্থহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। তারপর মর্ম্মভেদী চীৎকার করে একবার খালি "প্রসাদ" বলে ডেকে ভেলার উপরে পড়ে গেল। উত্তরে লক্ষ উর্ম্মিবালারা চাঁদের কিরণে চিক্-মিক্ করে' লক্ষ নিষ্ঠুরা তরুণীর মতো ভেলার আশে পাশে প্রতিহত হ'য়ে খিল্ খিল্ করে' হাস্‌তে লাগল আর কৌতুক করে' ডাকতে লাগল—"প্রসাদ প্রসাদ !"

সমাপ্ত।